সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী

ঈমানের হাকীকত

সূচীপত্র

মুসলমান হবার জন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা	৫
মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য	১০
ভাববার বিষয়	১৭
কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ	২৪
পাক কালেমা ও নাপাক কালেমা	৩২
কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্য	৩৯

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুসলমান হবার জন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা

প্রত্যেক মুসলমানই একথা ভালো করে জানে যে, দুনিয়ায় ইসলাম আল্লাহ তাআলার একটি সবচেয়ে বড় নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা তাকে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত করে সৃষ্টি করেছেন এবং ইস-লামের ন্যায় এত বড় একটা নিয়ামত তাকে দান করেছেন বলে প্রত্যেক মুসল-মান আল্লাহর শোকর আদায় করে থাকে। এমন কি, স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও ইসলামকে মানুষের প্রতি সবচেয়ে বড় ও উৎকৃষ্ট নিয়ামত বলে ঘোষণা করেছেন। বলেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط ـ المائدة ٣

"আজ আমি তোমাদের আনুগত্যের বিধান (জীবন বিধান) পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।"–সূরা মায়েদা ঃ ৩

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের প্রতি এই যে, অনুগ্রহ করেছেন, এর হক আদায় করা তাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। কারণ যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের হক আদায় করে না, সে বড়ই অকৃতজ্ঞ। আর সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার এ বিরাট অনুগ্রহের কথা ভুলে যাওয়া। এখন আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের হক কিভাবে আদায় করা যেতে পারে ? তাহলে আমি তার উত্তরে বলব যে, আল্লাহ তাআলা যখন আপনাকে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত করে সৃষ্টি করেছেন, তখন পূর্ণরূপে ও খাঁটিভাবে তার অনুগামী হতে পারলেই আল্লাহ তাআলার এ অনুগ্রহের হক আদায় হবে। আপনাকে যখন আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন, তখন তাঁর এ অনুগ্রহ ও দয়ার হক আদায় করতে হলে আপনাকে খাঁটি মুসলমান হতে হবে। এছাড়া আপনি অন্য কোনো প্রকারেই এবং কোনো উপায়েই তাঁর এ মহান উপকারের 'হক' আদায় করতে পারেন না। আর আপনি যদি এই 'হক' আদায় করতে না পারেন বা না-করেন, তাহলে আপনি এ অকৃতজ্ঞতার জন্য মহা অপরাধী হবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকেই এ মহাপাপ হতে রক্ষা করুন। আমীন।

অতপর আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, পূর্ণ মুসলমান কিভাবে হওয়া যায় ? তবে তার উত্তর খুবই বিস্তৃত ও লম্বা হবে। এ পুস্তকে আমি ক্রমশ এর এক একটি অংশ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে থাকবো। সর্বপ্রথম আমি এমন একটি বিষয় বলবো, মুসলমান হতে হলে যার প্রয়োজন সকলের আগে এবং যাকে বলা যায় মুসলমান হওয়ার পথের প্রথম ধাপ।

একটু ধীরভাবে চিন্তা করে দেখুন যে, আপনারা সদাসর্বদা যে 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন, এর অর্থ কি ? মানুষ কি মায়ের গর্ভ হতেই ইসলাম ধর্ম সাথে করে নিয়ে আসে ? মুসলিম ব্যক্তির পুত্র অথবা মুসলিম ব্যক্তির পৌত্র হলেই কি মুসলমান হওয়া যায় ? ব্রাহ্মণের পুত্র হলেই যেমন ব্রাহ্মণ, চৌধুরীর পুত্র হলেই যেমন চৌধুরী এবং শুদ্রের পুত্র হলেই যেমন শুদ্র হওয়া যায়, তেমনি রূপে মুসলমান নামধারী ব্যক্তির পুত্র হলেই কি মুসলমান হতে পারে ? 'মুসলমান' কি কোনো বংশ বা কোনো শ্রেণীর নাম ? ইংরেজ জাতির মধ্যে জন্ম হলেই ইংরেজ, চৌধুরী বংশে জন্মিলেই চৌধুরী হয়, তেমনি মুসলমানরাও কি 'মুসলমান' নামক একটি জাতির বংশে জন্মলাভ করেছে বলেই 'মুসলমান' নামে অভিহিত হবে ? আমার এসব প্রশ্নের উত্তরে আপনারা কি এটাই বলবেন না যে, 'না', 'মুসলমান' তাকে বলে না। মায়ের গর্ভ হতেই মুসলমান হয়ে কেউ জন্মে না, বরং ইসলাম গ্রহণ করলেই মুসলমান হওয়া যায় এবং ইসলাম ত্যাগ করলেই মানুষ আর মুসলমান থাকে না—মুসলিম সমাজ হতে একেবারে খারিজ হয়ে যায়। যে কোনো লোক—সে ব্রাহ্মণ হোক কিংবা পাঠান হোক, ইংরেজ হোক অথবা আমেরিকান, বাংগালী হোক অথবা হাবশী —সে যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখনই সে মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি 'মুসলমান' সমাজে জন্মগ্রহণ করেও ইসলামের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান পালন করে চলে না, সে মুসলমান রূপে গণ্য হতে পারে না ; সে সৈয়দের পুত্রই হোক আর পাঠানের পুত্রই হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

আমার পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলোর এ জবাব হতেই জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলার বড় নিয়ামত—মুসলমান হওয়ার নিয়ামত—যা আপনি লাভ করেছেন, ওটা জন্মগত জিনিস নয়, তাকে আপনি মায়ের গর্ভ হতে জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই লাভ করতে পারেন না এবং আজীবন এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করুন আর না-ই করুন তা আপনার সাথে নিজে নিজেই সর্বদা লেগে থাকবে —এমন জিনিসও তা নয়। এটা একটি চেষ্টালভ্য নিয়ামত ; তা লাভ করতে হলে আপনাকে রীতিমত চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা-সাধনা করে যদি আপনি তা লাভ করেন, তবেই তাকে আপনি পেতে পারেন।—আর এর প্রতি যদি মোটেই খেয়াল না করেন, তবে এর সৌন্দর্য হতে বঞ্চিত হবেন (নাউযুবিল্লাহ)।

অতএব, প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম গ্রহণ করলেই মানুষ মুসলমান হয়। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ কি ? মুখে মুখে যে ব্যক্তি 'আমি মুসলমান' বা 'আমি মুসলমান হয়েছি' বলে চীৎকার করবে, তাকেই কি মুসলমান মনে করতে হবে ? অথবা পূজারী ব্রাহ্মণেরা যেমন না বুঝে কতকগুলো সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করে, তেমনিভাবে আরবী ভাষায় কয়েকটি শব্দ না বুঝে মুখে উচ্চারণ করলেই কি মুসলমান হওয়া যাবে ? ইসলাম গ্রহণ করার তাৎপর্য কি এটাই ? উক্ত প্রশ্নের জবাবে আপনারা কি এটাই বলবেন না যে, ইসলাম গ্রহণের অর্থ এটা নয়। ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবস্থাকে বুঝে আন্তরিকতার সাথে সত্য বলে বিশ্বাস করা, জীবনের একমাত্র ব্রত ও আদর্শ হিসেবেই এটাকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা ; ইসলাম গ্রহণ করার তাৎপর্য এটাই। কাজেই যিনি এরূপ না করবেন তিনি মুসলমান হতে পারবেন না। আপনাদের এ জবাব হতে এটাই প্রকাশ পেল যে, প্রথমত ইসলাম জেনে ও বুঝে নেয়া এবং বুঝে নেয়ার পর তাকে কাজে পরিণত করার নাম ইসলাম গ্রহণ। কেউ কিছু না জেনেও ব্রাহ্মণ হতে পারে, কারণ সে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব সে ব্রাহ্মণ থাকবে, কেউ কিছু না জেনেও চৌধুরী হতে পারে, যেহেতু সে চৌধুরীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে—চৌধুরীই সে থাকবে। কিন্তু ইসলামকে না জেনে কেউ মুসলমান হতে পারে না ; কারণ মুসলমান ব্যক্তির ঔরসে জন্ম হলেই মুসলিম হওয়া যায় না—ইসলামকে জেনে-বুঝে বিশ্বাস করে কাজ করলেই তবে মুসলমান হওয়া যায়। চিন্তা করে দেখুন, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও জীবনব্যবস্থা না জেনে তাকে বিশ্বাস করা ও তদনুযায়ী কাজ করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে ? আর না জেনে, না বুঝে এবং বিশ্বাস না করেই বা মানুষ মুসলমান হতে পারে কিরূপে ? অতএব, বুঝা যাচ্ছে যে, মূর্খতা নিয়ে মুসলমান হওয়া ও মুসলমান থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। যারা মুসলমানের ঘরে জন্মলাভ করেছে, মুসলমান নামে যারা নিজেদের পরিচয় দেয় ও মুসলমান বলে দাবী করে তারা সকলেই প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নয়। যিনি ইসলাম কি তা জানেন এবং বুঝে-শুনে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই মুসলমান। কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে নামের পার্থক্য নয়। অতএব, একজনের নাম রামপ্রসাদ, এজন্য সে হিন্দু এবং আর একজনের নাম আবদুল্লাহ, অতএব সে মুসলমান—তা হতে পারে না। পরন্তু কাফের ও মুসলমানের মধ্যে শুধু পোশাকের পার্থক্যই আসল পার্থক্য নয়। কাজেই একজন ধূতি পরে বলে সে হিন্দু এবং অন্যজন পায়জামা বা লুঙ্গী পরে বলে সে মুসলমান বিবেচিত হতে

পারে না। বরং মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে আসল পার্থক্য হচ্ছে উভয়ের ইলম বা জ্ঞানের পার্থক্য। এক ব্যক্তি কাফের এই জন্য যে, সে জানে না তার সৃষ্টিকর্তার সাথে তার কি সম্পর্ক এবং তার বিধান অনুসারে জীবন-যাপনের প্রকৃত পথ কোন্‌টি ? কিন্তু একটি মুসলমান সন্তানের অবস্থাও যদি এরূপ হয়, তবে তার ও কাফের ব্যক্তির মধ্যে কোন্‌ দিক দিয়ে পার্থক্য করা যাবে ? এবং এ দু'জনের মধ্যে পার্থক্য করে আপনি একজনকে কাফের ও অপরজনকে মুসলমান বলবেন কেমন করে ? কথাগুলো বিশেষ মনোযোগ সহকারে এবং ধীরভাবে ভেবে দেখা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলার যে মহান নিয়ামতের জন্য আপনারা শোকর আদায় করছেন, একে লাভ করা এবং রক্ষা করা এ দু'টি কাজই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ইলম বা জ্ঞানের ওপর। ইলম বা জ্ঞান না থাকলে মানুষ তা পেতে পারে না—সামান্য পেলেও তাকে বাঁচিয়ে রাখা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সবসময়ই তাকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা ও খুঁতখুঁতে ভাব মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। মুসলমান না হয়েও এক শ্রেণীর লোক নিজেদের মুসলমান মনে করে, এর একমাত্র কারণ তাদের মূর্খতা। যে ব্যক্তি একেবারেই জানে না যে, ইসলাম ও কুফরের মধ্যে এবং ইসলাম ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য কি, সে তো অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের পথিকের মত ; সরল রেখার ওপর দিয়ে চলতে চলতে আপনা আপনি তার পা দু'খানা কখন যে পিছলিয়ে যাবে বা অন্য পথে ঘুরে যাবে, তা সে জানতেই পারবে না। জীবনের পথে চলতে চলতে সে সরল পথ হতে কখন যে সরে গিয়েছে, তা সে টেরও পাবে না। এমনও হতে পারে যে, পথিমধ্যে কোনো ধোঁকাবাজ শয়তান এসে তাকে বলবে—"মিঞা তুমি তো অন্ধকারে পথ ভুলে গিয়েছ, আমার সাথে চল, আমি তোমাকে তোমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেব।" বেচারা অন্ধকারের যাত্রী নিজের চোখে যখন সরল-সঠিক পথ দেখতে পায় না, তখন মূর্খতার দরুনই নিজের হাত কোনো দাজ্জালের হাতে সঁপে দিয়ে তার অনুসরণ করতে আরম্ভ করবে এবং সে তাকে পথভ্রষ্ট করে কোথা হতে কোথা নিয়ে যাবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা থাকবে না। তার নিজের হাতে আলো নেই এবং সে নিজে পথের রেখা দেখতে ও চিনে চলতে পারে না বলেই তো সে এতবড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছে যদি আলো থাকে, তবে সে পথও ভুলবে না, আর অন্য কেউও তাকে গোমরাহ করে বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না। এ কারণেই ধারণা করে নিতে পারেন যে, ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়া এবং পবিত্র কুরআনের উপস্থাপিত বিধান ও হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদত্ত শিক্ষা ভাল করে না জানা মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে কতবড় বিপদের কথা ! এ অজ্ঞতার কারণে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হতে পারে এবং অপর কোনো দাজ্জালও তাঁকে বিপদগামী করতে পারে। কিন্তু যদি তার কাছে জ্ঞানের আলো থাকে,

তবে সে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং প্রতি ধাপে ইসলামের সরল পথ দেখতে পাবে। প্রতি পদেই কুফরি, গোমরাহী, পাপ, জ্বেনা, হারামী প্রভৃতি যেসব বাঁকা পথ ও হারাম কাজ সামনে আসবে, তা সে চিনতে এবং তা হতে বেঁচে থাকতে পারবে। আর যদি কোনো পথভ্রষ্টকারী তার কাছে আসে তবে তার দু'-চারটি কথা শুনেই তাকে চিনতে পারবে। এবং এ লোকটি যে পথভ্রষ্টকারী ও এর অনুসরণ করা যে কিছুতেই উচিত নয়, তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে।

আমি যে ইলম বা জ্ঞানের কথা উল্লেখ করলাম, এর ওপরই আপনাদের ও আপনাদের সন্তান-সন্ততির মুসলমান হওয়া ও মুসলমান থাকা একান্তভাবে নির্ভর করে। এটা সাধারণ বস্তু নয়, একে অবহেলাও করা যায় না। কৃষক তার ক্ষেত-খামারের কাজে অলসতা করে না, ক্ষেতে পানি দিতে এবং ফসলের হেফাজত করতে গাফলতি করে না, গরু-বাছুরগুলোকে ঘাস-কুটা দিতে অবহেলা করে না। কারণ এসব ব্যাপারে অলসতা করলে তার না খেয়ে মরার ও প্রাণ হারাবারও আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু মুসলমান হওয়া ও মুসলমান থাকা যে জ্ঞানের ওপর নির্ভর করছে, তা লাভ করতে মানুষ কেন এত অবহেলা করছে? এতে কি ঈমানের মত অতি প্রিয় ও মূল্যবান নিয়ামত নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় নেই? ঈমান কি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় নয়? মুসলমানগণ প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে যতটা সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করে, এর দশ ভাগের এক ভাগও কি ঈমান রক্ষার কাজে ব্যয় করতে পারে না?

আপনারা প্রত্যেকে এক একজন মৌলভী হবেন, বড় বড় কিতাব পড়ে এবং জীবনের দশ বারোটি বছর কেবল পড়াশুনার কাজে ব্যয় করে মস্তবড় একজন আল্লামা হবেন, এমন কথা আমি বলছি না। মুসলমান হওয়ার জন্য এত কিছু পড়ার বা বড় কোনো ডিগ্রী লাভ করার কোনো আবশ্যকতা নেই। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, আপনারা রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র এক ঘন্টা সময় দীনি এলম (ইসলামী বিদ্যা) শিখার কাজে ব্যয় করুন। অন্ততপক্ষে প্রত্যেক মুসলমান বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই এতটুকু ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা দরকার, যা হতে তারা পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য জানতে পারবে, তা ভাল রূপে বুঝতে পারবে, তা ভালরূপে বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। আর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব অন্যায় কুসংস্কার দূর করতে এবং সেই স্থানে যা স্থাপন করতে এসেছিলেন, তাও উত্তমরূপে জানতে পারবে এবং আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবন যাপনের জন্য যে বিশেষ নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার সাথে তারা ভাল করে পরিচিত হতে পারবে। এটুকু ইলম হাসিল করার জন্য খুববেশী সময়ের দরকার করে না, আর ঈমান যদি বাস্তবিকই কারো প্রিয় বস্তু হয়, তবে এ কাজে একটা ঘন্টা মাত্র ব্যয় করা তার পক্ষে এতটুকুও কঠিন কাজ নয়।

মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য

প্রত্যেক মুসলমান নিশ্চয়ই একথা জানে যে, মুসলমান ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্মান কাফের ব্যক্তিদের অপেক্ষা অনেক উচ্চে। আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানকে পসন্দ করেন এবং কাফেরকে অপসন্দ করেন। মুসলমানের গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে কাফেরের অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। মুসলমান জান্নাতে যাবে এবং কাফের জাহান্নামে। কিন্তু মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে এতখানি পার্থক্য কেন হলো, সেই সম্বন্ধে একটু গভীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক।

কাফের ব্যক্তিরা যেমন হযরত আদম আলাইহিস সালামের সন্তান, মুসলমানরাও তেমনি তাঁর সন্তান। মুসলমান যেমন মানুষ, কাফেররাও তেমনি মানুষ। মুসলমানদের মত তাদেরও হাত-পা, চোখ-কান সবই আছে। তারাও এ পৃথিবীর বায়ূতেই শ্বাস গ্রহণ করে, এ যমীনের ওপর বাস করে এবং খাদ্য খায়। তাদের জন্ম এবং মৃত্যু মুসলমানদের মতোই হয়। যে আল্লাহ মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাহলে মুসলমানদের স্থান উচ্চে এবং তাদের স্থান নীচে হবে কেন ? মুসলমান কেন জান্নাতে যাবে আর তারা কেন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে ? একথাটি বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখা আবশ্যক। মুসলমানদের এক একজনের নাম রাখা হয়েছে আবদুল্লাহ্, আবদুর রহমান বা তদনুরূপ অন্য কোনো নাম, অতএব তারা মুসলমান। আর কিছু লোকের নাম রাখা হয়েছে দীননাথ, তারা সিং, রবার্টসন প্রভৃতি, কাজেই তারা কাফের ; কিংবা মুসলমানগণ খাতনা করায়, আর তারা তা করায় না, মুসলমান গরুর গোশত খায়, তারা তা খায় না—শুধু এটুকু কথার জন্যই মানুষে মানুষে এতবড় পার্থক্য হতে পারে না। আল্লাহ তাআলাই যখন সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সকলকেই তিনি লালন-পালন করেন—তিনি এতবড় অন্যায় কখনও করতে পারেন না। কাজেই তিনি এ রকম সামান্য বিষয়ের কারণে মানুষে মানুষে এতবড় পার্থক্য করবেন এবং তাঁরই সৃষ্ট এক শ্রেণীর মানুষকে অকারণে দোযখে নিক্ষেপ করবেন—তা কিছুতেই হতে পারে না।

বাস্তবিকই যদি তা না হয়, তবে উভয়ের মধ্যে আসল পার্থক্য কোথায় তা চিন্তা করে দেখতে হবে। বস্তুত উভয়ের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কেবল মাত্র কুফরি ও ইসলামের। ইসলামের অর্থ—আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা এবং কুফরীর অর্থ আল্লাহকে অস্বীকার করা, অমান্য করা ও আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়া। মুসলমান ও কাফের উভয়ই মানুষ, উভয়ই আল্লাহ তাআলার

সৃষ্ট জীব, তাঁরই আজ্ঞাবহ দাস। কিন্তু তাদের একজন অন্যজন অপেক্ষা এজন্য শ্রেষ্ঠ যে, একজন নিজের প্রকৃত মনিবকে চিনতে পারে, তাঁর আদেশ পালন করে এবং তাঁর অবাধ্য হওয়ার দুঃখময় পরিণামকে ভয় করে। কিন্তু অন্যজন নিজ মনিবকে চিনে না এবং তাঁর অবাধ্য হওয়ার দুঃখময় পরিণামকে ভয় করে না এবং তাঁর আদেশ পালন করে না, এজন্যই সে অধপাতে চলে যায়। এ কারণেই মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা সন্তুষ্ট এবং কাফেরের প্রতি অসন্তুষ্ট, মুসলমানকে জান্নাতে দেয়ার ওয়াদা করেছেন এবং কাফেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ভয় দেখিয়েছেন।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসলমানকে কাফের হতে পৃথক করা যায় মাত্র দু'টি জিনিসের ভিত্তিতে ঃ প্রথম, ইলম বা জ্ঞান ; দ্বিতীয়, আমল বা কাজ। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানকে প্রথমেই জানতে হবে যে, তার প্রকৃত মালিক কে ? কি তাঁর আদেশ ও নিষেধ ? তাঁর মর্জিমত চলার উপায় কি ? কিসে তিনি সন্তুষ্ট হন আর কিসে তিনি অসন্তুষ্ট হন—এসব বিস্তৃতভাবে জেনে নেয়ার পর নিজেকে প্রকৃত মালিকের একান্ত অনুগত বানিয়ে দেবে, তাঁর মর্জিমত চলবে, নিজের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করবে। তার মন যদি 'মালিকের' ইচ্ছার বিপরীত কোনো বস্তুর কামনা করে তবে সে নিজের মনের কথা না শুনে 'মালিকের' কথা শুনবে। কোনো কাজ যদি নিজের কাছে ভালো মনে হয়, কিন্তু মালিক সে কাজটিকে ভালো না বলেন, তবে তাকে মন্দই মনে করবে। আবার কোনো কাজ যদি নিজের মনে খুব মন্দ বলে ধারণা হয়, কিন্তু 'মালিক' তাকে ভালো মনে করেন এবং কোনো কাজ যদি নিজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে হয় অথচ 'মালিক' যদি তা করার হুকুম দেন, তবে তার জান ও মালের যতই ক্ষতি হোক না কেন, তা সে অবশ্যই করবে। আবার কোনো কাজকে যদি নিজের জন্য লাভজনক মনে করে, আর 'মালিক' তা করতে নিষেধ করেন তবে তাতে দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পত্তি লাভ করতে পারলেও তা সে কখনই করবে না। ঠিক এ ইলম ও এরূপ আমলের জন্যই মুসলমান আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দাহ্। তার ওপর আল্লাহ্ তাআলার রহমত বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা তাকে সম্মান দান করেন। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে কাফের কিছুই জানে না এবং এ জ্ঞান না থাকার দরুনই তার কার্যকলাপও তদনুরূপ হয় না এ জন্য যে, সে আল্লাহ্ তাআলা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ এবং তাঁর অবাধ্য বান্দাহ্। ফলত সে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হবে।

এ আলোচনার শেষকথা এই যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, অথচ কাফেরের মতোই জাহেল বা অজ্ঞ এবং আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্য এমতাবস্থায় কেবল নাম, পোশাক ও খানা-পিনার পার্থক্যের কারণে সে

কাফের অপেক্ষা কোনোভাবেই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না, আর কোনো কারণেই সে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ্ তাআলার রহমতের হকদার হতে পারে না।

ইসলাম কোনো জাতি, বংশ বা সম্প্রদায়ের নাম নয়। কাজেই বাপ হতে পুত্র এবং পুত্র হতে পৌত্র আপনা-আপনিই তা লাভ করতে পারে না। ব্রাহ্মণের পুত্র মূর্খ এবং চরিত্রহীন হলেও কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের পুত্র বলেই সে ব্রাহ্মণের মর্যাদা পেয়ে থাকে এবং উচ্চ বংশ বলে পরিগণিত হয়। আর চামারের পুত্র জ্ঞানী ও গুণী হয়েও নীচ ও হীন থেকে যায়। কারণ সে চামারের মত নীচ জাতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু ইসলামে এসব বংশ বা গোত্রীয় মর্যাদার বিন্দুমাত্র স্থান নেই। এখানে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন ঃ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ "তোমাদের মধ্যে যে লোক আল্লাহ্ তাআলাকে বেশী ভয় করে এবং সকলের অধিক তাঁর আদেশ পালন করে চলে সে-ই তাঁর কাছে অধিক সম্মানিত।" হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম একজন মূর্তি-পূজারীর ঘরে জন্ম লাভ করেছিলেন ; কিন্তু তিনি আল্লাহ্ তাআলাকে চিনতে পেরে তাঁর আদেশ পালন করলেন ; এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সমস্ত জগতের নেতা বা ইমাম করে দিয়েছিলেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পুত্র একজন নবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিল ; কিন্তু সে আল্লাহ্ তাআলাকে চিনতে পারল না বলে তাঁর অবাধ্য হয়ে গেল। এজন্য তার বংশমর্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হলো না। উপরন্তু যে শাস্তি দেয়া হলো, সমস্ত দুনিয়া তা হতে শিক্ষা লাভ করতে পারে। অতএব বুঝে দেখুন, আল্লাহ্ তাআলার কাছে মানুষে মানুষে যা কিছু পার্থক্য হয়ে থাকে, তা কেবল ইলম ও আমলের জন্য মাত্র। দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর অনুগ্রহ কেবল তারাই পেতে পারে, যারা তাঁকে তাঁর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী চিনে এবং তাঁর অনুসরণ করে।

কিন্তু যাদের মধ্যে এ গুণ নেই, তাদের নাম আবদুল্লাহ্ই হোক, আর আবদুর রহমান হোক, দীননাথই হোক, আর তারাসিং-ই হোক, আল্লাহ্ তাআলার কাছে এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—এরা কেউই আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ পাবার অধিকার পেতে পারে না।

মুসলমানগণ নিজেদের মুসলমান বলে মনে করে এবং মুসলমানের ওপর আল্লাহ্ তাআলার রহমত বর্ষিত হয় বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু একটু চোখ খুলে চেয়ে দেখুন, আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ কি তাদের ওপর সত্যই নাযিল হচ্ছে ? পরকালের কথা পরের জন্যই রইল, এই দুনিয়ায় মুসলমানদের যে দুরাবস্থা হচ্ছে তা-ই একবার খেয়াল করে দেখা আবশ্যক।

মুসলমান বাস্তবিকই যদি আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দাহ হতো তাহলে আল্লাহর সেই প্রিয়জনেরা দুনিয়ায় নানাভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে কেন ? আল্লাহ কি যালেম (নাউযুবিল্লাহ) ? মুসলমান যদি আল্লাহ্ তাআলার 'হক' জানতো, তাঁর আদেশ পালন করতো, তাহলে তিনি তাঁর অবাধ্য বান্দাদেরকে মুসলমানদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা করে দেবেন কেন ? আর তাদেরকে তার আনুগত্যের বিনিময়ে শাস্তিইবা দেবেন কোন্ কারণে ? আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয়ই যালেম নন এবং তাঁর আনুগত্য করার বিনিময় অপমান ও শাস্তি নয়। একথা যদি একান্তভাবে বিশ্বাস করা হয় তবে স্বীকার করতেই হবে যে, মুসলমানদের মুসলমান হওয়ার দাবীতে কিছুটা গলদ আছে। তাদের নাম সরকারী দফতরে নিশ্চয়ই মুসলমান হিসেবে লিখিত আছে ; কিন্তু সেই সরকারী দফতরের সার্টিফিকেট অনুসারে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে বিচার হবে না। আল্লাহ্ তাআলার নিজস্ব দফতর রয়েছে এবং তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজেই তাঁর দফতরে মুসলমানদের নাম তাঁর অনুগত লোকদের তালিকায় লিখিত আছে, না অবাধ্য লোকদের তালিকায় লিখিত হয়েছে তা খোঁজ করে দেখা আবশ্যক। আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের কাছে কিতাব পাঠিয়েছেন, তা পড়ে মুসলমানগণ প্রকৃত 'মালিক'-কে চিনতে পারে ; কিন্তু ঐ কিতাবে যা লিখিত আছে, তা জানার জন্য মুসলমানগণ একটুও চেষ্টা করেছে কি ? আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি নবী পাঠিয়েছেন, তিনি মুসলিম হওয়ার উপায় ও নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর নবী দুনিয়ায় এসে কি শিক্ষা দিয়েছেন, তা জানার জন্য তারা কখনও যত্নবান হয়েছে কি ? আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে ইজ্জত লাভ করার পথের সন্ধান বলে দিয়েছেন, কিন্তু তারা সেই পথে চলছে কি ? যেসব কাজ মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে, আল্লাহ্ তাআলা তা এক এক করে বলে দিয়েছেন, কিন্তু মুসলমান কি সেসব কাজ ত্যাগ করেছে ? এ প্রশ্নগুলোর কি উত্তর হতে পারে ? যদি স্বীকার করা হয় যে, আল্লাহ্ তাআলার কিতাব হতে মুসলমানগণ যেমন কোনো জ্ঞান লাভ করতে চেষ্টা করেনি, তেমনি তাঁর প্রদর্শিত পথেও তারা একটুও চলেনি, তাহলে তারা মুসলমান হলো কিরূপে এবং তারা পুরস্কারই বা কিরূপে চাচ্ছে। তারা যে ধরনের মুসলমানীর দাবী করছে, ফলও তেমনি পাচ্ছে, আর তেমনি পুরস্কার তারা পরকালেও পাবে।

আমি প্রথমেই বলেছি যে, মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে ইলম ও আমল— জ্ঞান ও কাজ ছাড়া আর কোনোই প্রভেদ নেই। কারো ইলম ও আমল যদি কাফেরের ইলম ও আমলের মত হয়, আর তবুও সে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয় তাহলে বুঝতে হবে যে, তার মতো মিথ্যাবাদী আর কেউই নয়।

কাফের পবিত্র কুরআন পড়ে না এবং তাতে কি লিখিত আছে তা সে জানে না। কিন্তু মুসলমানের অবস্থা যদি এ রকমই হয় তাহলে সে নিজেকে মুসলমান বলবে কোন্ অধিকারে ? নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার মানুষকে যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করার জন্য যে সরল পথ দেখিয়েছেন, কাফেরগণ তা কিছুই জানে না। এখন মুসলমানও যদি সেই রকমই অজ্ঞ হয় তাহলে তাকে 'মুসলমান' কেমন করে বলা যায় ? কাফের আল্লাহর মর্জি মতো চলে না, চলে নিজ ইচ্ছামত ; মুসলমানও যদি সেরূপ স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন হয়, সেরূপ নিজের খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্তী হয়, সেরূপই আল্লাহর প্রতি উদাসীন ও বেপরোয়া হয় এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুগত দাস হয়, তবে তার নিজেকে 'মুসলিম' অর্থাৎ 'আল্লাহর আদেশ পালনকারী' বলার কি অধিকার আছে ? কাফের হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করে না। যে কাজে সে লাভ ও আনন্দ দেখতে পায় —তা আল্লাহ তাআলার কাছে হালাল হোক কি হারাম হোক—অসংকোচে সে তাই করে যায়। মুসলমানও যদি এ নীতি গ্রহণ করে তবে তার ও কাফের ব্যক্তির পার্থক্য রইল কোথায় ? মোটকথা, কাফেরের ন্যায় মুসলমানও যদি ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ হয় এবং কাফের ও মুসলমানের কাজ-কর্ম যদি একই রকম হয়, তাহলে দুনিয়ায় কাফেরের পরিবর্তে কেবল মুসলমানরাই সম্মান লাভ করবে কেন ? কাফেরের ন্যায় মুসলমানরাও পরকালে শাস্তি ভোগ করবে না কিসের জন্য ? এটা এমন একটি গুরুতর বিষয় যে, এ সম্বন্ধে আমাদের ধীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক।

একথা মনে করার কারণ নেই যে, আমি মুসলমানকে কাফেরের মধ্যে গণ্য করছি, কারণ তা কখনও উচিত নয়। আমি নিজেও এ সম্বন্ধে যারপর নেই চিন্তা করি এবং আমি চাই যে, আমাদের সমাজের প্রত্যেকেই এ সম্বন্ধে চিন্তা করুক। আমরা আল্লাহ তাআলার রহমত হতে বঞ্চিত হচ্ছি কেন, চারিদিক হতে আমাদের ওপর কেন এ বিপদরাশি এসে পড়ছে ? যাদেরকে আমরা 'কাফের' অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্য বান্দাহ মনে করি, তারা আমাদের ওপর সকল ক্ষেত্রে বিজয়ী কেন ? আর আমরা যারা আল্লাহর আদেশ পালনকারী বলে দাবী করি, তারাই বা সব জায়গায় পরাজিত কেন ? এর কারণ সম্বন্ধে আমি যতই চিন্তা করি, ততই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আমাদের ও কাফেরদের প্রতি বর্তমানে শুধু নামেই পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। কার্যত আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি অবহেলা, ভয়হীনতা এবং অবাধ্যতা দেখাতে কাফেরদের অপেক্ষা কিছুমাত্র পিছনে নেই। তাদের ও আমাদের মধ্যে সামান্য কিছু প্রভেদ অবশ্যই আছে, কিন্তু তার জন্য আমরা কোনোরূপ প্রতিদান বা পুরস্কারের আশা করতে

পারি না, বরং সে জন্য আমরা অধিক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। কেননা আমরা জানি যে, কুরআন আল্লাহ্ তাআলার কিতাব, অথচ আমরা এর সাথে কাফেরের ন্যায়ই ব্যবহার করছি। আমরা জানি, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃত, শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী, অথচ তাঁর অনুসরণ করা আমরা কাফেরদের মতই ত্যাগ করেছি। আমরা জানি যে, মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহ্ তাআলা লানত করেছেন এবং ঘুষখোরদের ও ঘুষদাতা উভয়ই নিশ্চিতরূপে দোযখে যাবে বলে ঘোষণা করেছেন, সুদখোর ও সুদদাতাকে জঘন্য পাপী বলে অভিহিত করেছেন। চোগলখুরী ও গীবতকারীকে আপন ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন, অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতার জন্য কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু এ সমস্ত কথা জানার পরও আমরা কাফেরদের মতোই বেপরোয়াভাবে এসব কাজ করে যাচ্ছি। মনে হয়, যেন আমাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় মাত্রই নেই। এজন্য কাফেরদের তুলনায় আমরা কিছুটা 'মুসলমান' হয়ে থাকলেও আমাদের জীবনে তার কোনো প্রতিফলন আমরা পাচ্ছি না ; বরং কেবল শাস্তিই পাচ্ছি—নানাভাবে এবং নানাদিক দিয়ে। আমাদের ওপর কাফেরদের জয়লাভ এবং সর্বত্র আমাদের পরাজয় এ অপরাধেরই শাস্তি। ইস-লাম রূপ এক মহান নেয়ামত আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, অথচ আমরা তার বিন্দুমাত্র কদর করিনি, এটা অপেক্ষা বড় অপরাধ আর কি হতে পারে ?

ওপরে যা কিছু বলেছি, তা কাউকে ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে বলিনি, ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে কলমও ধরিনি। আসলে উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যা কিছু হারিয়ে ফেলেছি, তা ফিরে পাবার জন্য চেষ্টা করা হোক। হারানো জিনিস পুনরায় পাওয়ার চিন্তা মানুষের ঠিক তখনই হয়, যখন সে নিশ্চিতরূপে জানতে ও বুঝতে পারে যে, তার কি জিনিস এবং কত মূল্যবান জিনিস হারিয়েছে। এজন্যই আমি মুসলমানদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করছি, যদি তাদের জ্ঞান ফিরে আসে এবং তারা যে প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস হারিয়ে ফেলেছে তা যদি বুঝতে পারে, তবে তা পুনরায় পেতে চেষ্টা করবে।

আমি প্রথম প্রবন্ধে বলেছি যে, মুসলমানের প্রকৃত মুসলমান হবার জন্য সর্বপ্রথম একান্ত দরকার হচ্ছে খাঁটি ইসলামী শিক্ষা ও ইসলাম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা কি ? রাসূল পাকের প্রদর্শিত পথ কি ? ইসলাম কাকে বলে ? কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য কোন্ বিষয়ে ? এসব কথা প্রত্যেক মুসলমানেরই সুস্পষ্টরূপে জেনে নেয়া আবশ্যক। এ জ্ঞান না থাকলে কোনো ব্যক্তিই মুসলমান হতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা সেই ইলম অর্জন করতে কোনোই চেষ্টা করে না। এটা হতে বুঝা যায় যে, তারা যে কত বড় নেয়ামত ও রহমত হতে বঞ্চিত, সে কথা এখন পর্যন্ত তারা বুঝতে

পারেনি। শিশু কেঁদে না ওঠলে মা-ও তাকে দুধ দেয় না, পিপাসু ব্যক্তি পিপাসা বোধ করলেই নিজেই পানির তালাশ করে, আল্লাহ্-ও তাকে পানি মিলিয়ে দেন। মুসলমানদের নিজেদেরই যদি পিপাসা না থাকে, তবে পানি ভরা কূপ তাদের মুখের কাছে আসলেও তাতে কোনো লাভ নেই। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা কত বড় এবং কত ভীষণ ক্ষতি তা তাদের নিজেদেরই অনুধাবন করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলার কিতাব তাদেরই কাছে মওজুদ আছে, অথচ নামাযে তারা আল্লাহ্ তাআলার কাছে কি প্রার্থনা করে, তা তারা জানে না, এটা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হতে পারে ? যে 'কালেমা' পাঠ করে তারা ইসলামে প্রবেশ করে, এর অর্থ পর্যন্ত তারা জানে না। এ কালেমা পাঠ করার সাথে সাথে তাঁদের ওপর কি কি দায়িত্ব এসে পড়ে তাও জানে না। বস্তুত একজন মুসলমানের পক্ষে এতদপেক্ষা ক্ষতি ও দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। ক্ষেত-খামার নষ্ট হওয়ার পরিণাম যে কি, তা সকলেই জানে। ফসল নষ্ট হলে না খেয়ে মরতে হবে তাতে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার পরিণাম যে কত ভীষণ ও ভয়াবহ, সেই কথা তারা অনুভব করতে পারে না। কিন্তু এ ক্ষতির কথা যখন তারা অনুভব করতে পারবে, তখন তারা নিজেরাই এ ভীষণ ক্ষতির কবল হতে বাঁচতে সচেষ্ট হবে, তখন ইনশাআল্লাহ্ তাদেরকে এ ক্ষতি হতে বাঁচাবার ব্যবস্থাও করা হবে।

ভাববার বিষয়

বর্তমান দুনিয়ায় একমাত্র মুসলমানদের কাছেই আল্লাহ্ তাআলার কালাম সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অপরিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান আছে। কুরআনের যে শব্দ আল্লাহর নবীর প্রতি নাযিল হয়েছিল, আজ পর্যন্ত অবিকল তা-ই আছে। এ দিক দিয়ে দুনিয়ার মুসলমানগণ ভাগ্যবান জাতি, তাতে সন্দেহ নেই। আবার দুনিয়ার এ মুসলমানই একমাত্র হতভাগ্য ; যাদের কাছে আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র কালাম এর আসল অবস্থায় বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এর বরকত ও অফুরন্ত নিয়ামত হতে তারা বঞ্চিত। কুরআন শরীফ তাদের ওপর এজন্য নাযিল হয়েছিল যে, তারা এটা পড়বে, বুঝবে, তদনুযায়ী কাজ করবে। এটা এসেছিল তাদেরকে শক্তি এবং সম্মান দান করার জন্য। এটা তাদেরকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রকৃত 'খলিফা' বানাতে এসেছিল। আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যতদিন তারা কুরআনের হেদায়াত অনুযায়ী চলেছে, ততদিন এটা তাদেরকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নেতা বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু আজকাল তারা কুরআন দ্বারা জ্বিন-ভূত তাড়ান ছাড়া আর কোনো কাজই করছে না। এর আয়াত লিখে তারা গলায় বাঁধে, তা লিখে ও গুলে পানি খায়, আর শুধু পুণ্য সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে না বুঝে পাঠ করে, তারা আজ এর কাছে হিদায়াত চায় না। তাদের ধর্ম বিশ্বাস কি রকম হবে, তা তারা কুরআনের কাছে জিজ্ঞেস করে না। তাদের কাজ-কর্ম কিরূপ হওয়া উচিত, তাদের চরিত্র কিরূপ হওয়া দরকার, তারা এ দুনিয়ায় কিরূপে জীবন যাপন করবে, লেন-দেন কিভাবে করবে, কোন্ নিয়ম অনুসারে তারা মানুষের সাথে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা করবে, আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদের প্রতি এবং তাদের নিজেদের প্রতি তাদের কর্তব্য কি, আর তা কিভাবেই বা পালন করবে, দুনিয়ায় কাব হুকুম মানবে আর কার হুকুম অমান্য করবে, কার সাথে সম্বন্ধ রাখা উচিত, কার সাথে নয়, তাদের মিত্র কে আর শত্রুই বা কে, কিসে তাদের সম্মান ও সফলতা হবে, কোন্ কাজে ধন-দৌলত লাভ হবে, তাদের ব্যর্থতা এবং ক্ষতিই বা কিসে হতে পারে—কুরআনের নিকট এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব চাওয়া মুসলমানগণ এখন ছেড়ে দিয়েছে। এখন তারা কাফের, মুশরিক, গোমরাহ ও স্বার্থপর লোকদের কাছে এবং নফসরূপ শয়তানের কাছে এ সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ চায়, আর এদের পরামর্শ অনুযায়ীই তারা কাজ করে। কাজেই আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের হুকুম অনুসারে কাজ করার যে পরিণাম হতে পারে, তাই হয়েছে। আর সেই ফলই তারা আজ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ ও এক এক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে। কুরআন শরীফ সমস্ত মংগলের উৎস, লোকেরা যে রকমের এবং যে পরিমাণের মংগল এর কাছে চাবে,

২—

কুরআন তাই এবং ততটুকুই দান করবে। জ্বিন-ভূত তাড়ান, সর্দি-কাশির চিকিৎসা, মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরী লাভ আর এ ধরনের সব ছোট ছোট ও নিকৃষ্ট জিনিস যদি তারা এর কাছে চায়, তবে তাই দান করবে। আর যদি দুনিয়ার বাদশাহী এবং সারেজাহানের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পেতে চায়, তবে তাও তাদেরকে দেবে। এমন কি, যদি আল্লাহর আরশের কাছে পৌঁছতে চায়, তবে কুরআন তাদেরকে সেখান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। মূলত তা তার পাত্রের যোগ্যতার ওপরই নির্ভর করে। তারা আজ মহাসমুদ্রের কাছ হতে মাত্র দু' ফোটা পানি নিচ্ছে, অথচ সমুদ্র তাদেরকে বড় বড় নদী দান করতে পারে।

আমাদের মুসলমান ভাইগণ আল্লাহর পাক কিতাবের সাথে যে ধরনের অসংগত ব্যবহার করে থাকে, তা এতই হাস্যকর ব্যাপার যে, এরা নিজেরা যদি দুনিয়ার কোনো কাজে অন্য কোনো লোককে সে ধরনের ব্যবহার করতে দেখতো তবে তারা তাকে বিদ্রূপ করতে ত্রুটি করতো না, বরং তারা তাকে পাগল মনে করতো। কোনো ব্যক্তি যদি ডাক্তারের কাছ হতে ওষুধের তালিকা লিখে এনে কাপড়ে জড়িয়ে গলায় বেঁধে রাখে, কিংবা পানিতে ধুয়ে তা পান করে, তবে আপনারা তাকে কি বলবেন ? আপনারা কি তার কাজ দেখে হাসবেন না এবং তাকে নিতান্ত আহাম্মক মনে করবেন না ? কিন্তু সবচেয়ে বড় ডাক্তার আপনাদের রোগের চিকিৎসা ও আপনাদেরকে নিরাময় করার উদ্দেশ্যে যে অতুলনীয় তালিকা লিখে দিয়েছেন, তার সাথে দিন-রাত আপনাদের চোখের সামনেই এ ধরনের ব্যবহার হচ্ছে। অথচ সেই জন্য কারো এতটুকু হাসির উদ্রেক হয় না। একথা কেউই ভেবে দেখেন না যে, ওষুধের তালিকা গলায় বাঁধার বা ধুয়ে খাবার জিনিস নয়, এর বিধান অনুযায়ী ওষুধ বানিয়ে ব্যবহার করার জন্যই তা লিখিত হয়েছে।

কোনো রুগ্ন ব্যক্তি যদি একখানা ডাক্তারী কিংবা হেকিমী বই নিয়ে পড়তে শুরু করে আর মনে করে যে, এ বইখানা পড়লে সব রোগ আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে। তবে আপনারা তাকে কি বলবেন ? আপনারা কি বলবেন না যে, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাকে পাগলখানায় পাঠিয়ে দাও ? কিন্তু হায় ! একমাত্র মহা চিকিৎসক আল্লাহ তাআলা আপনাদের রোগের চিকিৎসার জন্য যে মহান কিতাব পাঠিয়েছেন, তার সাথে আপনাদের ব্যবহার ঠিক একই রকম হচ্ছে। আপনারা তা পড়েন আর মনে করেন যে, এটা পড়লেই সব রোগ দূর হয়ে যাবে—এর বিধান মতো কাজ করার কোনোই দরকার নেই। আর এ কিতাব যেসব জিনিসকে ক্ষতিকর মনে করে বর্জন করতে বলে তা বর্জন করারও কোনো দরকার মনে করেন না। তাহলে রোগ দূর করার জন্য যে

ব্যক্তি শুধু বই পড়াই যথেষ্ট মনে করে, তার সম্পর্কে আপনারা যে মত প্রকাশ করে থাকেন, আপনাদের নিজেদের সম্পর্কে সেরূপ মত প্রকাশ করেন না কেন?

আপনি জানেন না এমন কোনো ভাষায় যদি আপনার কাছে কোনো চিঠি আসে তবে আপনি অমনি এর অর্থ জানার জন্য ঐ ভাষা যে ব্যক্তি জানে তার কাছে দৌড়ে যান। এর অর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি জানতে না পারেন, ততক্ষণ আপনার বিন্দুমাত্র শান্তি থাকে না। সাধারণ কায়-কারবারের চিঠি নিয়ে আপনি এই প্রকার অস্থির হয়ে পড়েন ; এতে আপনার হয়ত দু'-চার পয়সারই উপকার হতে পারে, তার বেশী নয়। কিন্তু সারেজাহানের মালিক আল্লাহর কাছ হতে যে চিঠি আপনার কাছে এসেছে, আর যার মধ্যে আপনার ইহকাল ও পরকালের সমস্ত মংগল নিহিত আছে তাকে আপনি অবহেলা করে ফেলে রাখেন, এর অর্থ জানার কোনো আগ্রহ বা অস্থিরতাই আপনার মধ্যে জাগে না। এটাকি বাস্তবিকই আশ্চর্যের ব্যাপার নয় ? এসব কথা আমি হাসি-তামাশার জন্য বলছি না। আপনারা যদি একথা চিন্তা করে দেখেন তবে আপনাদের অন্তরই বলে দেবে যে, দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় অবিচার হচ্ছে আল্লাহর এ মহান কিতাবের প্রতি। আর এ অবিচার শুধু তারাই করছে, যারা এ কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে বলে দাবী করে এবং এর জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত বলে প্রচার করে। পবিত্র কুরআনের প্রতি তাদের ঈমান নিশ্চয়ই আছে এবং তারা এটাকে প্রাণ-অপেক্ষাও বেশী ভালবাসে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ঠিক তারাই এর ওপর সকলের অপেক্ষা বেশী যুলুম করছে। আর আল্লাহর কালামের প্রতি যুলুম করার ফল তো সকলেরই জানা আছে। খুব ভাল করে বুঝে নিন, আল্লাহর কালাম মানুষের কাছে এ জন্য আসেনি যে, এটা পেয়েও সে দুর্ভাগ্য ও দুঃখ-মুসিবতের মধ্যে পড়ে থাকবে। পবিত্র কুরআন তো সৌভাগ্য ও সার্থকতা লাভ করার একমাত্র উৎস ; এটা দুর্ভাগ্য ও হীনতা লাভের কোনো কারণ হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ

طٰهٰ - مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى -(طه ١-٢)

"ত্ব-হা- হে নবী ! তোমার প্রতি কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে, এটা সত্ত্বেও তুমি হতভাগ্য হয়ে থাকবে।"–সূরা ত্ব-হা ঃ ১-২

এর দ্বারা মানুষের ভাগ্য খারাপ হওয়ার এবং সকলের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হওয়ার কোনোই আশংকা নেই। কোনো জাতির কাছে আল্লাহর কালাম বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তার লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হওয়া, পরের অধীন হওয়া, অপমানিত ও পদদলিত হওয়া, গোলামীর নাগপাশে বন্দী হওয়া, তার সমস্ত কর্তৃত্ব অপরের হাতে ন্যস্ত হওয়া এবং পরের দ্বারা জন্তু-জানোয়ারের মত বিতাড়িত ও নির্যাতিত

হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এমন দুঃখপূর্ণ অবস্থা সেই জাতির ঠিক তখনই হতে পারে যখন তারা আল্লাহর কালামের ওপর যুলুম করতে শুরু করে। বনী ইসরাঈলের অবস্থা আপনাদের অজানা নয়। তাদের প্রতি তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ـ(المائدة : ٦٦)

"তাওরাত, ইনজীল এবং অন্যান্য যেসব কিতাব তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল, তারা যদি তা অনুসরণ করে চলতো, তবে তাদের প্রতি আকাশ হতে রিযিক বর্ষিত হতো এবং যমীন হতে খাদ্যদ্রব্য ফুটে বের হতো।"

কিন্তু তারা আল্লাহ তাআলার এসব কালামের প্রতি যুলুম করেছিল, আর তার ফলে ঃ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ق وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ٥ـ البقرة ٦١

"লাঞ্ছনা এবং পরমুখাপেক্ষিতা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর গযবে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল, এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহর বাণীকে অমান্য করতে শুরু করেছিল, আর পয়গাম্বরগণকে অকারণে হত্যা করেছিল। তাছাড়া আরও কারণ এই যে, তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল এবং তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা তারা অতিক্রম করে গিয়েছিল।"–সূরা বাকারা ঃ ৬১

অতএব, যে জাতি আল্লাহর কিতাব ধারণ করে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ায় লাঞ্ছিত, পদদলিত এবং পরের অধীন ও পরের তুলনায় শক্তিহীন হয়, নিসন্দেহে মনে করবেন যে, তারা নিশ্চয়ই আল্লাহর কালামের ওপর যুলুম করছে। আর তাদের ওপর এই যে দুঃখ-বিপদের তুফান আসছে, তার মূল কারণই হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের প্রতি যুলুম। অতএব, আল্লাহর এ গযব হতে রেহাই পাওয়া এছাড়া আর কোনো উপায় থাকতে পারে না। তারা আল্লাহর কালামের প্রতি যুলুম করা ত্যাগ করবে এবং এর ষোলআনা 'হক' আদায় করতে চেষ্টা করবে। আপনারা যদি এ মহাপাপ হতে ফিরে না থাকেন, আপনাদের এ হীন অবস্থার কিছুতেই পরিবর্তন হবে না। (তা আপনারা গ্রামে গ্রামে কলেজ-ই খুলুন,

আপনাদের প্রত্যেকটি সন্তান গ্রাজুয়েট হোক, আর ইহুদীদের মত সুদী কারবার করে কোটিপতিই হোক না কেন, তার ফল প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়)।

মুসলমান কাকে বলে এবং মুসলিম শব্দের অর্থ কি, একথা প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বপ্রথমেই জেনে নিতে হবে। কারণ মনুষ্যত্ব কাকে বলে এবং মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য কি, তা যদি মানুষের জানা না থাকে, তবে সে জানোয়ারের মতো কাজ করতে শুরু করবে—সে তার মনুষ্যত্বের মূল্য বুঝতে পারবে না। অনরূপভাবে যদি কেউ একথা জানতে না পারে যে, মুসলমান হওয়ার অর্থ কি এবং মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কেমন করে পার্থক্য করা যায়, তবে সে তো অমুসলমানের মতো কাজ-কর্ম করতে শুরু করবে এবং তার মুসলমানীর কোনো সম্মানই সে রক্ষা করতে পারবে না। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানকে এবং মুসলমানের প্রত্যেকটি সন্তানকেই ভালো করে জেনে নিতে হবে যে, সে যে নিজেকে নিজে মুসলমান মনে করে এ মুসলমান হওয়ার অর্থ কি ? মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে কি পরিবর্তন ও পার্থক্য হয়ে যায় ? তার ওপর কি কর্তব্য ও দায়িত্ব এসে পড়ে ? ইসলামের কোন্ সীমার মধ্যে থাকলে মানুষ মুসলমান থাকতে পারে এবং কোন্ সীমা অতিক্রম করলেই বা সে মুসলমানী হতে খারিজ হয়ে যায় ? এসব কথা না জানলে মুখ দিয়ে সে মুসলমানীর যতই দাবী করুক না কেন, তার মুসলমান থাকা সম্ভব নয়।

ইসলাম অর্থ আল্লাহর আনুগত্য করা ও হুকুম পালন করে চলা। নিজেকে আল্লাহ তাআলার কাছে সোপর্দ করে দেয়ার নাম হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহর সম্মুখে নিজের আযাদী ও স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করার নাম ইসলাম। আল্লাহর বাদশাহী এবং আনুগত্যকে মাথানত করে স্বীকার করে নেয়ার নাম ইসলাম। যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত কাজ-কারবারকে আল্লাহর হাতে সঁপে দেয়, সেই ব্যক্তি মুসলমান। আর যে ব্যক্তি নিজের সব ব্যাপারে নিজের ইচ্ছামত সম্পন্ন করে কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোও হাতে তা সোপর্দ করে সে মুসলমান নয়। আল্লাহর হাতে সঁপে দেয়ার তাৎপর্য এই যে, তিনি তাঁর কিতাব এবং তাঁর নবীর মারফত যে হেদায়াত ও সৎপথের বিধান পাঠিয়েছেন, মানুষ তাকে পুরোপুরি কবুল করবে এবং তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করতে পারবে না। জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে এবং কাজে শুধু পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নিয়ম অনুসরণ করে চলবে। যে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি, দুনিয়ার প্রথা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলকেই—সবকিছু পশ্চাতে ফেলে রেখে এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই কেবল আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসের কাছে পথের সন্ধান জানতে চায়—জিজ্ঞেস করে যে, আমার কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়, আর সেখান হতে যে নিয়মই পাওয়া যাক না কেন বিনা আপত্তিতে তা মেনে নেয়,

তার বিপরীত যা তা সবই সে অস্বীকার করে—শুধু সেই ব্যক্তি মুসলমান। কারণ সে তো নিজেকে আল্লাহর কাছে একেবারে সঁপে দিয়েছে। আর এভাবে আল্লাহর হাতে নিজেকে সঁপে দিলেই মানুষ মুসলমান হতে পারে। এর বিপরীত—যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ওপর মোটেই নির্ভর করে না, বরং নিজের মন যা বলে তাই করে, কিংবা বাপ-দাদা হতে চলে আসা নিয়ম-কানুনের অনুসরণ করে চলে, কিংবা দুনিয়ায় যা কিছু হচ্ছে সে-ও তাই করে, নিজের কোনো ব্যাপারেই সে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কাছে জিজ্ঞেস করে না যে, তার কি করা উচিত, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধান জেনে সে বলে ওঠে যে, আমার বুদ্ধি তা গ্রহণ করতে চায় না, তাই আমি তা মানি না, অথবা বাপ-দাদার কাল হতে তার উল্টা নিয়ম চলে আসছে কাজেই তার অনুসরণ করব না ; কিংবা দুনিয়ার নিয়ম তার বিপরীত, তাই আমি সেই নিয়ম অনুসারেই চলবো—তবে সেই ব্যক্তি কিছুতেই মুসলমান নয়। যদি সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তবে সে মিথ্যাবাদী সন্দেহ নেই।

আপনি যখন কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পড়েন এবং মুসলমান হওয়ার কথা স্বীকার করেন, তখন আপনি তার মধ্য দিয়ে একথাও স্বীকার করে থাকেন যে, আপনার আল্লাহর আইন আপনার জন্য একমাত্র আইন ; আল্লাহ তাআলাই আপনার প্রভু ও আদেশ কর্তা। তখন আপনার শুধু আল্লাহরই আনুগত্য করতে হবে। আপনার কাছে শুধু সেই বিধা-নই সত্য বিধানরূপে স্বীকৃতি পাবে যা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সাহায্যে পাওয়া যায়। এর অর্থ এই যে, আপনি মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর সামনে নিজের আযাদী বিসর্জন দিয়েছেন।

অতপর আপনার নিজের স্বতন্ত্র মত বলতে কিছুই থাকতে পারে না, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রথা বা পারিবারিক নিয়ম-রীতিরও কোনোই গুরুত্ব থাকতে পারে না অথবা অমুক হযরত এবং অমুক বুজর্গ সাহেব কি বলেছেন, আল্লাহর কালাম এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতের মোকাবিলায় এ ধরনের কোনো কথাই আপনি এখন পেশ করতে পারেন না। আপনার প্রত্যেকটি বিষয়ই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সামনে পেশ করাই এখন আপনার একমাত্র কাজ। যা তার অনুরূপ হবে না আপনি তা উঠিয়ে দূরে নিক্ষেপ করবেন—তা যারই প্রথা হোক না কেন। নিজেকে মুসলমান বলা এবং তারপর পবিত্র কুরআন ও হাদীসকে বাদ দিয়ে নিজের মত, দুনিয়ার প্রথা কিংবা মানুষের কোনো কথা বা কাজের অনুসরণ করা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী। কোনো অন্ধ ব্যক্তি যেমন নিজেকে চোখওয়ালা বলতে পারে না, কোনো নাকহীন ব্যক্তি যেমন নিজেকে

াাকওয়ালা বলতে পারে না, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত কাজ-কর্ম পবিত্র কুরআন হাদীস অনুসারে সমাধা করে না, বরং তা পরিত্যাগ করে নিজের বুদ্ধি বা দুনিয়ার প্রথা অথবা কোনো ব্যক্তি বিশেষের কথা বা কাজের অনুসরণ করে চলে—সে কিছুতেই নিজেকে মুসলমান বলতে পারে না।

কেউ যদি নিজে মুসলমান থাকতে না চায়, তবে তার মুসলমান থাকার জন্য তার ওপর জোর-জবরদস্তি করতে পারে না। যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করা এবং যে কোনো নাম ধারণ করার স্বাধীনতা প্রত্যেকটি মানুষেরই রয়েছে। কিন্তু কোনো মানুষ যখন নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তখন তার একথা খুব ভালো করেই বুঝে নেয়া উচিত যে, সে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান থাকতে পারে, যতক্ষণ সে ইসলামের সীমার মধ্যে থাকবে। আল্লাহর কালাম এবং তাঁর রাসূলের হাদীসকে সত্য ও মঙ্গলের একমাত্র মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করা এবং এর বিরোধী প্রত্যেকটি জিনিসকে বাতিল ও মিথ্যা মনে করাই হচ্ছে ইসলামের সীমা। এ সীমার মধ্যে যে থাকবে সে মুসলমান ; এটা যে লংঘন করবে সে ইসলাম হতে বিচ্যুত-বহির্ভূত হয়ে পড়বে। তারপরও সে যদি নিজেকে মুসলমান মনে করে এবং মুসলমান বলে দাবী করে, তবে সে নিজেকেও ধোঁকা দিচ্ছে, আর দুনিয়াকেও ধোঁকা দিচ্ছে সন্দেহ নেই।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ - المائدة ٤٤

"যে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না সে কাফের।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৪)

কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ

আপনারা জানেন, মানুষ একটি কালেমা পাঠ করে ইসলামের সীমার মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। সেই কালেমাটি খুব লম্বা-চওড়া কিছু নয় কয়েকটি শব্দ মাত্র। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এ কয়টি শব্দ মুখে উচ্চারণ করলেই মানুষ একেবারে বদলে যায়। একজন কাফের যদি এটা পড়ে, তবে সে মুসলমান হয়ে যায়। ফলে পূর্বে সে নাপাক ছিল, এখন সে পাক হয়ে গেল। পূর্বে তার ওপর আল্লাহর গযব আসতে পারতো ; কিন্তু এখন সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হয়ে গেল। প্রথমে সে জাহান্নামে যাবার যোগ্য ছিল, এখন জান্নাতের দুয়ার তার জন্য খুলে গেল। শুধু এটুকুই নয়, এ 'কালেমার'র দরুন মানুষে মানুষেও বড় পার্থক্য হয়ে পড়ে। এ 'কালেমা' যারা পড়ে তারা এক উম্মাত আর যারা এটা অস্বীকার করে তারা হয় আলাদা এক জাতি। পিতা যদি 'কালেমা' পড়ে আর পুত্র যদি তা অস্বীকার করে তবে পিতা আর পিতা থাকবে না, পুত্র আর পুত্র বলে গণ্য হবে না, পিতার সম্পত্তি হতে সেই পুত্র কোনো অংশই পাবে না, তার নিজের মা ও বোন পর্যন্ত তাকে দেখা দিতে ঘৃণা করবে। পক্ষান্তরে একজন বিধর্মী যদি কালেমা পড়ে, আর ঐ ঘরের মেয়ে বিয়ে করে, তবে সে এবং তার সন্তান ঐ ঘর হতে মীরাস পাবে। কিন্তু নিজ ঔরসজাত সন্তান শুধু এ 'কালেমা'কে অস্বীকার করার কারণেই একেবারে পর হয়ে যাবে। এটা দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে, এ 'কালেমা' এমন জিনিস যা পর লোককে আপন করে একত্রে মিলিয়ে দেয়। আর আপন লোককে পর করে পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন করে।

একটু ভেবে দেখুন মানুষে মানুষে এতবড় পার্থক্য হওয়ার প্রকৃত কারণ কি ? 'কালেমা'তে কয়েকটা অক্ষর ছাড়া আর কি-ই বা রয়েছে ? কাফ, লাম, মীম, আলিফ, সীন আর এ রকমেরই কয়েকটা অক্ষর ছাড়া আর তো কিছুই নয়। এ অক্ষরগুলো যুক্ত করে মুখে উচ্চারণ করলেই কোন্ যাদুর স্পর্শে মানুষ এতখানি বদলে যায় ! শুধু এতটুকু কথা দ্বারা কি মানুষের পরস্পরের মধ্যে এত আকাশ-পাতাল পার্থক্য হতে পারে ? ...... একটু চিন্তা করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন—আপনাদের বিবেক-বুদ্ধি বলে ওঠবে যে, কয়েকটা অক্ষর মিলিয়ে মুখে উচ্চারণ করলেই এতবড় ক্রিয়া কিছুতেই হতে পারে না। মূর্তিপূজক মুশরিকগণ অবশ্য মনে করে যে, একটা মন্ত্র পড়লেই পাহাড় টলে যাবে। যমীন ফেটে যাবে এবং তা হতে পানি উথলে ওঠবে !—মন্ত্রের কোনে অর্থ কেউ অবগত হোক বা না-ই হোক, তাতে কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কারণ

অক্ষরের মধ্যেই যাবতীয় শক্তি নিহিত আছে বলে তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। কাজেই তা মুখে উচ্চারিত হলেই সকল রহস্যের দুয়ার খুলে যাবে। কিন্তু ইসলামে এরূপ ধারণার কোনোই মূল্য নেই। এখানে আসল জিনিস হচ্ছে অর্থ ; শব্দের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া বা তা'ছীর আছে, তা অর্থের দরুনই হয়ে থাকে। শব্দের কোনো অর্থ না হলে, তা মনের মূলের সাথে গেঁথে না গেলে এবং তার ফলে মানুষের চিন্তাধারা, বিশ্বাস, চরিত্র ও তার কাজ-কর্মে পরিবর্তন না ঘটলে, শুধু শব্দের উচ্চারণ করলেই কোনো লাভ নেই।

একথাটি সহজ উদাহরণ দ্বারা আপনাদেরকে বুঝাতে চাই। মনে করুন, আপনার ভয়ানক শীত লাগছে। এখন আপনি যদি মুখে 'লেপ-তোষক' 'লেপ-তোষক' করে চিৎকার করতে শুরু করেন, তবে শীত লাগা কিছুমাত্র কমবে না। সারা রাত বসে 'লেপ-তোষক' বলে হাজার তাসবীহ্ পড়লেও কোনো ফল ফলবে না। অবশ্য আপনি লেপ-তোষক যোগাড় করে যদি গায়ে দিতে পারেন তবে শীত লাগা নিশ্চয় বন্ধ হয়ে যাবে। এরূপে মনে করুন, আপনার তৃষ্ণা লেগেছে। এখন যদি আপনি সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত 'পানি' 'পানি' করে চিৎকার করতে থাকেন, তবে তাতে পিপাসা মিটবে না। কিন্তু এক গ্লাস পানি নিয়ে যদি পান করেন, তবে আপনার কলিজা অবশ্যই ঠাণ্ডা হবে। মনে করুন, আপনার অসুখ হয়েছে ; এখন যদি আপনি 'ওষুধ' 'ওষুধ' করে তাসবীহ্ পাঠ শুরু করেন, আপনার রোগ তাতে দূর হবে না। হাঁ যদি ঠিক ওষুধ খরিদ করে তা সেবন করেন, তবে আপনার রোগ সেরে যাবে। কালেমার অবস্থাও ঠিক এটাই। শুধু ছয়-সাতটি শব্দ মুখে বলে দিলেই এত বড় পার্থক্য হতে পারে না, যে মানুষ কাফের ছিল সে এর দরুন একেবারে মুসলমান হয়ে যাবে, নাপাক হতে পাক হবে, দুশমন লোক একেবারে বন্ধু হয়ে যাবে, জাহান্নামী ব্যক্তি একেবারে জান্নাতী হয়ে যাবে। মানুষে মানুষে এরূপ পার্থক্য হয়ে যাওয়ার একটি মাত্র উপায় আছে। তা এই যে, প্রথমে এ শব্দগুলোর অর্থ বুঝে নিতে হবে, সেই অর্থ যাতে মানুষের মনের মূলে শিকড় গাড়তে পারে, সেজন্য চেষ্টা করতে হবে। এভাবে অর্থ জেনে ও বুঝে যখন এটা মুখে উচ্চারণ করবেন, তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে, এ 'কালেমা' পড়ে আপনারা আপনাদের আল্লাহ্র সামনে কত বড় কথা স্বীকার করেছেন, আর এর দরুন আপনাদের ওপর কত বড় দায়িত্ব এসে পড়েছে। এসব কথা বুঝে শুনে যখন আপনারা 'কালেমা' পড়বেন, তখন আপনাদের চিন্তা এবং আপনার সমস্ত জীবনের ওপর এ 'কালেমা'র পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হবে। এরপর এ 'কালেমা'র বিরোধী কোনো কথা আপনাদের মন ও মগজে একটুও স্থান পেতে পারে না। চিরকালের তরে আপনাদের একথাই মনে করতে হবে যে, এ 'কালেমা'র বিপরীত যা তা

মিথ্যা—এ 'কালেমা'ই একমাত্র সত্য। আপনাদের জীবনের সমস্ত কাজ-কারবারে এ 'কালেমা'ই হবে একমাত্র হুকুমদাতা। এ 'কালেমা' পড়ার পরে কাফেরদের মতো স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন না। এখন এ 'কালেমা'রই হুকুম পালন করে চলতে হবে, এটা যে কাজ করতে বলবে তাই করতে হবে এবং যে কাজের নিষেধ করবে তা হতে ফিরে থাকতে হবে। এভাবে 'কালেমা' পড়লেই মানুষে মানুষে পূর্বোল্লিখিতরূপে পার্থক্য হতে পারে।

এখন 'কালেমা'র অর্থ কি, তা পড়ে মানুষ কি কথা স্বীকার করে, আর তা স্বীকার করলেই মানুষ কোন্ বিধান মত চলতে বাধ্য হয় প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করবো।

কালেমার অর্থ ঃ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তাআলার রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ।" কালেমার মধ্যে যে 'ইলাহ' শব্দটি রয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে মালিক, সৃষ্টিকর্তা, মানুষের জন্য বিধান রচনাকারী, মানুষের দোয়া যিনি শোনেন এবং গ্রহণ করেন—তিনিই উপাসনা পাবার একমাত্র উপযুক্ত। এখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়লে তার অর্থ এই হবে যে, আপনি প্রথম স্বীকার করলেন ঃ এ দুনিয়া আল্লাহ্ ছাড়া সৃষ্টি হতে পারেনি, এর সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই বর্তমান আছেন, আর সেই সৃষ্টিকর্তা বহু নয়—মাত্র একজন। তিনি ছাড়া আর কারোও খোদায়ী বা প্রভুত্ব কোথাও নেই ; দ্বিতীয়ত 'কালেমা' পড়ে আপনি স্বীকার করলেন যে, সেই এক আল্লাহ-ই মানুষের ও সারে জাহানের মালিক। আপনি ও আপনার প্রত্যেকটি জিনিস এবং দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তুই তাঁর। সৃষ্টিকর্তা তিনি, রিযিকদাতা তিনি, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হুকুম মত হয়ে থাকে। সুখ ও বিপদ তাঁরই তরফ হতে আসে। মানুষ যা কিছু পায়, তাঁরই কাছ হতে পায়—সকল কিছুর দাতা প্রকৃতপক্ষে তিনি। আর মানুষ যা হারায়, তা প্রকৃতপক্ষে তিনিই কেড়ে নেন। শুধু তাঁকেই ভয় করা উচিত, শুধু তাঁরই কাছে প্রার্থনা করা উচিত, তাঁরই সামনে মাথা নত করা উচিত। কেবলমাত্র তারই ইবাদাত ও বন্দেগী করা কর্তব্য। তিনি ছাড়া আমাদের মনিব, মালিক ও আইন রচনাকারী আর কেউই নেই। একমাত্র তাঁরই হুকুম মেনে চলা এবং কেবল তাঁরই আইন অনুসারে কাজ করা আমাদের আসল ও একমাত্র কর্তব্য।

'কালেমা' لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়ে আপনি আল্লাহর কাছে এ ওয়াদা-ই করে থাকেন, আর সারা দুনিয়া এ মৌলিক অঙ্গীকারের সাক্ষী হয়ে থাকে। এর বিপরীত কাজ করলে আপনার জিহ্বা, আপনার হাত-পা, আপনার প্রতিটি পশম এবং আকাশ ও পৃথিবীর এক একটি অণু-পরমাণু যাদের সামনে আপনি

এ ওয়াদা করেছিলেন আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে সাক্ষ্য দেবে। আপনি সেখানে একেবারে অসহায় হয়ে পড়বেন। আপনার সাফাই প্রমাণ করার জন্য একটি সাক্ষী কোথাও পাবেন না। কোনো উকিল কিংবা ব্যারিষ্টার আপনার পক্ষ সমর্থন করার জন্য সেখানে থাকবে না। বরং স্বয়ং উকিল সাহেব কিংবা ব্যারিষ্টার সাহেব দুনিয়ার আদালতে যারা আইনের মারপ্যাঁচ খেলে থাকে, তারা সকলেই সেখানে আপনারই মতো নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে যাবে। সেই আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে, জাল দলীল দেখিয়ে এবং উকিলের দ্বারা মিথ্যা ওকালতী করিয়ে আপনারা রক্ষা পেতে পারবেন না। দুনিয়ার পুলিশের চোখ হতে আপনারা নিজেদের অপরাধ লুকাতে পারেন, কিন্তু আল্লাহর পুলিশের চোখ হতে তা গোপন করা সম্ভব নয়। দুনিয়ার পুলিশ ঘুষ খেতে পারে, আল্লাহর পুলিশ কখনও ঘুষ খায় না। দুনিয়ার সাক্ষী মিথ্যা বলতে পারে, আল্লাহর সাক্ষী সকলেই সত্যবাদী—তারা মিথ্যা বলে না। দুনিয়ার বিচারকেরা অবিচার করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা অবিচারক নন। তারপর আল্লাহ যে জেলখানায় পাপীদেরকে বন্দী করবেন, সেখান হতে পলায়ন করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। কাজেই আল্লাহর সাথে মিথ্যা ওয়াদা করা বড় আহাম্মকি এবং সবচেয়ে বেওকুফী সন্দেহ নেই। যখন আল্লাহর সামনে ওয়াদা করছেন, তখন খুব ভালো করে বুঝে শুনে করুন এবং তা পালন করার চেষ্টা করুন, নতুবা শুধু মুখে ওয়াদা করতে আপনাকে কেউ জবরদস্তি করছে না। কারণ মুখে শুধু স্বীকার করার কোনো মূল্যই নেই।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার পর বলতে হয় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এর অর্থ এই যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যস্থতায়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর আইন মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন—একথা আপনারা স্বীকার করছেন। আল্লাহকে নিজেদের মনিব, মালিক ও বাদশাহ স্বীকার করার পর একথা অবগত হওয়ার একান্ত দরকার ছিল যে, সেই বাদশাহে দো-আলমের আইন ও হুকুম কি? আমরা কোন্ কাজ করলে তিনি খুশী হবেন, আর কোন্ কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন? কোন্ আইন অনুসরণ করলে তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন, আর কোন্ আইনের বিরোধিতা করলে তিনি আমাদেরকে শাস্তি দেবেন? এসব জানার জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর দূত নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর মধ্যস্থতায় তিনি আমাদের প্রতি তাঁর কিতাব পাঠিয়েছেন এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর হুকুম মতো কিরূপে জীবন যাপন করতে হয়, তা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিয়ে গেছেন।

কাজেই আপনারা যখন বলেন, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' তখন এর দ্বারা আপনারা একথাই স্বীকার করে থাকেন যে, যে আইন এবং যে নিয়ম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আপনারা তা অনুসরণ করে চলবেন। আর যে আইন এর বিপরীত হবে তাকে পদদলিত করবেন। এ ওয়াদা করার পর যদি আপনারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রচার আইনকেই ছেড়ে দেন, আর দুনিয়ার আইন অনুসরণ করে চলেন তবে আপনাদের চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী ও বেঈমান আর কেউ নেই। কারণ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রচারিত আইনকে একমাত্র সত্য আইন মেনে এবং তার অনুসরণ করে চলার অঙ্গীকার করেই আপনারা ইসলামের সীমার মধ্যে এসেছেন। একথা স্বীকার করেই আপনারা মুসলমানদের ভাই হয়েছেন, এরই দরুন আপনারা মুসলমান পিতার উত্তরাধিকারী হতে পেরেছেন। এরই দৌলতে আপনারা মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছেন। এরই কারণে আপনাদের সন্তান ন্যায়ত সন্তান হতে পেরেছে। এরই দরুন মুসলমানগণ আপনাদেরকে সাহায্য করেছে, আপনাদেরকে যাকাত দিয়েছে, আপনাদের জান-মাল ও মান-সম্মানের হেফাযত করার দায়িত্ব নিয়েছে। এতসব হওয়া সত্ত্বেও যদি আপনারা নিজেদের ওয়াদা ভঙ্গ করেন, তবে এটা অপেক্ষা বড় বেঈমানী দুনিয়ায় আর কি হতে পারে ? আপনরা যদি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه-এর অর্থ জানেন এবং জেনে-বুঝেই এটা স্বীকার করেন, তাহলে সকল অবস্থাতেই আল্লাহর আইন মেনে চলা আপনাদের কর্তব্য। আল্লাহর আইন জারি হয়ে না থাকলেও আপনাদের এটা জারি করা উচিত। যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহর পুলিশ, সৈন্য, আদালত এবং জেলখানা কোথাও মওজুদ নেই, কাজেই তাঁর আইন লংঘন করা সহজ, আর গভর্মেন্টের পুলিশ, ফৌজ, আদালত এবং জেলখানা চারদিকে বর্তমান আছে, কাজেই তার আইন ভঙ্গ করা বড়ই মুশকিল—তবে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি পরিষ্কার ভাষায়ই বলে দিচ্ছি যে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه কালেমা সে মিথ্যাই পড়েছে। সে এটা দ্বারা তার আল্লাহকে, সারে জাহানকে, সমস্ত মুসলমানকে এবং স্বয়ং নিজের মনকে ধোঁকা দিচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিপূর্বে কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ আমি বলেছি। এখন সে বিষয়ে অন্য আর একদিক দিয়ে ভেবে দেখতে বলছি।

আল্লাহ তাআলা আপনাদের এবং প্রত্যেক জিনিসেরই মালিক একথা আপনারা স্বীকার করছেন। কিন্তু এর অর্থ কি ? এর অর্থ এই যে, আপনাদের

জান-মাল আপনাদের নিজের দেহ আল্লাহর। আপনাদের হাত, কান এবং আপনাদের দেহের কোনো একটা অঙ্গও আপনাদের নিজের নয়। যে জমি আপনারা চাষাবাদ করেন, যেসব পশু দ্বারা আপনারা কাজ করান, যেসব জিনিস-পত্র আপনারা সবসময় ব্যবহার করছেন, এদের কোনোটাই আপনাদের নিজের নয়। সবকিছুই আল্লাহ তাআলার মালিকানা এবং আল্লাহর দান হিসেবেই এগুলো আপনারা পেয়েছেন। একথা স্বীকার করার পর আপনাদের একথা বলার কি অধিকার থাকতে পারে যে, জান-প্রাণ আমার, শরীর আমার, মাল আমার, অমুক জিনিস আমার, আর অমুক জিনিসটি আমার। অন্য একজনকে কোনো জিনিসের মালিক বলে ঘোষণা করার পর তার জিনিসকে আবার নিজের বলে দাবী করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। যদি বাস্তবিকই আল্লাহকে দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের মালিক মনে করেন, তবে তা হতে আপনা আপনি দু'টি জিনিস আপনাদের ওপর এসে পড়ে। প্রথম এই যে, আল্লাহ-ই যখন মালিক আর তিনি তাঁর মালিকানার জিনিস আমানত স্বরূপ আপনাদেরকে দিয়েছেন, তখন সেই মালিকের হুকুম মতোই আপনাদের সে জিনিসগুলো ব্যবহার করতে হবে। তাঁর মর্জির উলটা কাজ যদি এর দ্বারা করেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা আমানতের খেয়ানত করছেন। আপনাদের হাত-পা পর্যন্ত সেই মালিকের মর্জির বিপরীত কাজে ব্যবহার করার কোনো অধিকার আপনাদের নেই। আপনাদের চোখ দ্বারাও তার নিষিদ্ধ জিনিস দেখতে পারেন না, যা তাঁর মর্জির বিপরীত। আপনাদের এ জমি-জায়গাকে মালিকের বিধানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার আপনাদের কোনোই অধিকার নেই। আপনাদের যে স্ত্রী এবং সন্তানকে নিজেদের বলে দাবী করেন, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দান করেছেন বলেই তারা আপনাদের আপন হয়েছে, কাজেই তাদের সাথে আপনাদের ইচ্ছামত নয়—মালিকেরই হুকুম মত ব্যবহার করা কর্তব্য। তার মতের উলটা যদি ব্যবহার করেন, তবে আপনারা ডাকাত নামে অভিহিত হবার যোগ্য। পরের জিনিস হরণ করলে পরের জায়গা শক্তির বলে দখল করলে আপনারা তাকে বলেন, বেঈমান ; সেরূপ আল্লাহর দেয়া জিনিসকে নিজের মনে করে নিজের ইচ্ছা কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোও মর্জিমত যদি ব্যবহার করেন, তবে সেই বেঈমানীর অপরাধে আপনারাও অপরাধী হবেন। মালিকের মর্জি অনুসারে কাজ করলে যদিও আপনাদের কোনো ক্ষতি হয় হোক, জান চলে যায় যাক, হাত-পা ভেংগে যায় যাক, সন্তানের লোকসান হয় হোক, মাল ও জমি-জায়গা বরবাদ হয়ে যায় যাক, আপনারা সেই জন্য কোনো পরোয়া করবেন না। জিনিসের মালিকই যদি এর ক্ষয় বা ক্ষতি পসন্দ করেন, তবে তা করার তাঁর অধিকার আছে। তবে হাঁ,

মালিকের মর্জির খেলাফ যদি আপনারা করেন, আর তাতে যদি কোনো জিনিসের ক্ষতি হয়ে পড়ে, তবে সে জন্য আপনারাই অপরাধী হবেন, সন্দেহ নেই। কারণ পরের জিনিস আপনারা নষ্ট করেছেন। আপনারা আপনাদের জানকে পর্যন্ত নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন না। মালিকের মর্জি অনুসারে জান কুরবান করলে মালিকেরই হক আদায় হবে, তাঁর মতের উলটা কাজে প্রাণ দিলে মস্তবড় বেঈমানী করা হবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, মালিক যে জিনিসই আপনাকে দান করেছেন, তা যদি সেই মালিকের কাজেই ব্যবহার করেন, তবে তার দ্বারা কারোও প্রতি কোনো অনুগ্রহ হতে পারে না—মালিকের প্রতিও নয়। এ পথে যদি আপনারা কিছু দান করলেন, কোনো খেদমত করলেন, কিংবা আপনাদের প্রিয়বস্তু—প্রাণকে কুরবান করলেন, তবে তা কারোও প্রতি আপনাদের একবিন্দু অনুগ্রহ নয়। আপনাদের প্রতি মালিকের যে 'হক' ছিল এর দ্বারা শুধু তাই আদায় করলেন মাত্র। এতে গৌরব বা অহংকার করার মত কিংবা তারীফ বা প্রশংসা পাবার মতো কিছু নেই। মনে রাখবেন, মুসলমান ব্যক্তি মালিকের পথে কিছু খরচ করে কিংবা তার কিছু কাজ করে কিছুমাত্র গৌরব বোধ করে না, বরং সে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে ; গৌরব বা অহংকার ভাল কাজকে বরবাদ করে দেয়। যে ব্যক্তি প্রশংসা পাবার আশা করে এবং শুধু সে উদ্দেশ্যেই ভাল কাজ করে কারণ সে তার কাজের প্রতিফল এ দুনিয়াতেই পেতে চাচ্ছে, আর তাই সে পেয়েছে। নিখিল দুনিয়ার মালিক আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ দেখুন, তিনি তাঁর নিজের জিনিস আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন, আর বলেন যে, এ জিনিস তোমাদের কাছ থেকে আমি ক্রয় করলাম এবং তার মূল্যও তোমাদেরকে দেব। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের কি কোনো সীমা-পরিসীমা আছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -

"আল্লাহ তাআলা ঈমানদার ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করেছেন এবং তার বিনিময়ে তাদের জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১১১

আপনাদের সাথে মালিকের এরূপ ব্যবহার ! কিন্তু আপনি তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করছেন, তা একবার বিচার করে দেখুন। মালিক যে বস্তু আপনাদেরকে দিয়েছেন, তারপর সেই মালিক সে জিনিস মূল্য দিয়ে আপনাদের কাছ থেকে ক্রয় করেছেন, সে জিনিসকে আপনারা অন্যের কাছে বিক্রি করছেন, আর খুবই সামান্য ও নিকৃষ্ট মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করছেন। যার কাছে বিক্রি

করছেন সে মালিকের মর্জির উলটা কাজে আপনাদের সেসব জিনিসকে ব্যবহার করে, আর আপনারা তাদেরকে আপনাদের রেযেকদাতা মনে করেই তাদের কাজ করে থাকেন। মূলত আপনাদের দেহের শক্তিগুলো এমনভাবে বিক্রি করার কোনো অধিকার আপনাদের নেই। আল্লাহদ্রোহী শক্তি যা কিছু কিনতে চায়, আপনারা তাই তাদের কাছে বিক্রি করেন, তা অপেক্ষা বড় দুর্নীতি আর কি হতে পারে ? একবার বিক্রি করা জিনিসকে পুনরায় অন্যের কাছে বিক্রি করা আইনত এবং নীতিগতভাবে অপরাধ। দুনিয়ায় এজন্য আপনার বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনার মামলা চলতে পারে। আপনারা কি মনে করেন আল্লাহর আদালতে এ বিষয়ে মামলা চলবে না ?

পাক কালেমা ও নাপাক কালেমা

কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ ইতিপূর্বে বলেছি ; এখানে সেই সম্পর্কেই আর একটু ব্যাখ্যা করে আপনাদেরকে বুঝাতে চাই। কারণ এ কালেমাই ইসলামের মূল ভিত্তি, এরই সাহায্যে মানুষ ইসলামে দাখিল হয়, আর এ কালেমাকেই ভালো করে না বুঝে এবং সে অনুসারে নিজের জীবনকে গঠন না করে কোনো মানুষ মুসলমান থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে এ কালেমার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ۝ تُؤْتِىْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضْرِبُ
اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ
خَبِيْثَةِ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ
الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَايَشَآءُ ۝ - ابرهيم ٢٤-٢٧

"কালেমায়ে তাইয়্যেবার উদাহরণ যেমন কোনো ভাল জাতের গাছ, এর শিকড় মাটির নীচে মযবুত হয়ে গেঁথে রয়েছে। এর শাখা-প্রশাখাগুলো আকাশের শূন্যলোকে বিস্তৃত—আল্লাহর হুকুমে তা অনবরত ফলের পর ফলদান করছে। আল্লাহ এরূপ দৃষ্টান্ত মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য দিয়েছেন। এর বিপরীত হচ্ছে কালেমায়ে খাবিসাহ অর্থাৎ খারাপ আকিদা ও মিথ্যা কথা। এর উদাহরণ যেমন বন-জঙ্গলের ছোট ছোট আগাছা-পরগাছা। মাটির একেবারে উপরিভাগে তা জন্মে, সামান্য এক টানেই তা উৎপাটিত হয়ে যায় ; কারণ এর শিকড় মাটিতে খুব মজবুত হয়ে গাঁথতে পারে না। আল্লাহ সেই পাকা কথার দরুন মু'মিনদেরকে ইহকালে ও পরকালে সুদৃঢ় রাখেন এবং যালেমদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪-২৭

আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা এমন একটা অতুলনীয় উদাহরণ দিয়েছেন যে, আপনারা একটু চিন্তা করলেই এটা হতে খুব বড় শিক্ষা পেতে পারেন। দেখুন

একটি আম গাছের শিকড় মাটির কত নীচে গেঁথে রয়েছে, ওপরের দিকে কতখানি উচ্চ হয়ে ওঠেছে, তার কত ডাল-পালা চারদিকে বিস্তৃত হয়েছে, আর তাতে প্রতি বছর কত ভাল ভাল ফল ফলছে। কিন্তু এটা কেমন করে হলো ? এর বীজ খুব শক্তিশালী ছিল বলেই এত বড় একটা গাছ হবার তার পূর্ণ হক ছিল। আর সেই 'হক' এত সত্য ছিল যে, যখন এটা নিজের 'হক'-এর দাবী করলো, তখন মাটি, পানি, বায়ু, দিনের গরম, রাতের ঠাণ্ডা সব জিনিসই তার দাবী মেনে নিয়েছে। আমের সেই বীচি যার কাছে যা চেয়েছে তারা প্রত্যেকেই তাকে তা দিয়েছে। এভাবে সে নিজের অধিকারের জোরে এত বড় একটা গাছ হয়ে ওঠতে পেরেছে। পরে সে মিষ্টি মিষ্টি ফল দিয়ে একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বাস্তবিকই এমন একটা গাছ হওয়ার তার অধিকার ছিল। আকাশ ও পৃথিবীর সকল শক্তি একত্র হয়েও যদি তার সাহায্য করে থাকে, তবে তা কিছুমাত্র অন্যায় করেনি, বরং এদের এরূপ করাই উচিত ছিল। কারণ জমি, পানি, বায়ু এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক জিনিসের মধ্যে গাছ-পালার খোরাক যোগাবার ও এদের বড় করে তোলার শক্তি এজন্য নিহিত আছে যে, তা দ্বারা ভাল জাতের গাছগুলোর অনেক উপকার হবে।

এছাড়া বন-জঙ্গলে ছোট ছোট এমন কত গাছ আছে—যা নিজে নিজেই হয়েছে। এদের মধ্যে কি শক্তি আছে ? ছোট একটু শিকড় একটা ছোট ছেলে তা টেনে উপড়ে ফেলতে পারে। কিংবা তা এতই নরম ও দুর্বল যে, একটু দমকা হাওয়া লাগলেই তা নত হয়ে পড়ে। তা কাঁটায় ভরা, স্পর্শ করলেই কাঁটা বিদ্ধ হয়। তা মুখে দিলে মুখ নষ্ট করে দেয়। রোজ রোজ কত জন্ম হয়, কত যে উপড়িয়ে ফেলা হয়, তার হিসেব আল্লাহই জানেন। এগুলোর এরূপ অবস্থা কেন ? কারণ এগুলোর মধ্যে আম গাছের মত অতখানি জোর নেই। জমিতে যখন ভাল জাতের গাছ হয় না, তখন জমি বেকার পড়ে থেকে একেবারে হতাশ হয়ে যায়। কাজেই সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসব আগাছা পরগাছাকে তার বুকে স্থান দেয়। পানি কিছু সাহায্য করে, বায়ু তার কিছু শক্তি দান করে ; কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর কোনো জিনিসই এসব পরগাছার কোনো স্বত্ব স্বীকার করতে চায় না। এজন্য জমি তার বুকের মধ্যে এদের শিকড় বিস্তৃত হতে দেয় না, পানি ওর খুব বেশী সাহায্য করে না। আর বায়ুও ওকে প্রাণ খুলে বাতাস দান করে না। এভাবে টানাটানির পর যখন ওটা একটু মাথা জাগায়, তখন তা এত তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে ওঠে যাতে প্রমাণ হয়ে যায় যে, আকাশ ও পৃথিবীর শক্তিসমূহ মূলত এ আগাছা জন্মাবার জন্য নয়। আগাছা-গুলো প্রকৃতির বুক হতে সামান্য কিছু শক্তি যে পেয়েছে এদের পক্ষে এটাই মস্ত ভাগ্যের কথা।

এ দু'টি উদাহরণ সামনে রাখুন, তারপর কালেমায়ে তাইয়্যেবা ও কালেমায়ে খাবীসার পার্থক্য সম্পর্কে ভাল করে চিন্তা করুন।

কালেমায়ে তাইয়্যেবা কী ? .... একটা সত্য কথা ; এমন সত্য কথা যে, এ দুনিয়ায় তা অপেক্ষা অধিক সত্য কথা আর একটিও নেই। এক আল্লাহই সারেজাহানের ইলাহ, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই একথার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। মানুষ, জানোয়ার, গাছ, পাথর, বালুকণা, প্রবহমান ঝর্ণা, উজ্জ্বল সূর্য চারদিকে বিস্তৃত এ সমস্ত জিনিস—এর কোন্‌টাকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেননি ? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন ? তাঁর দয়া ও মেহেরবানী ছাড়া অন্য কারোও অনুগ্রহে কি এগুলো বেঁচে আছে ? এদের মধ্যে কোনো একটিকেও কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জীবন বা মৃত্যু দান করতে পারে ? এ সারেজাহান যখন আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি তাঁরই দয়ায় যখন এসবকিছু বর্তমান আছে এবং তিনিই যখন এসবের একমাত্র মালিক ও হুকুমদাতা, তখন যে সময়েই আপনি বলবেন এ পৃথিবীতে সে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোও প্রভুত্ব বা খোদায়ী নেই, তৎক্ষণাৎই আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটা জিনিসই বলে ওঠবে ঃ তুমি সত্য কথাই বলেছো, আমরা সকলেই তোমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি। সেই আল্লাহর সামনে যখন আপনি মাথা নত করবেন, বিশ্বভুবনের প্রত্যেকটি জিনিসই আপনার সাথে তারই সামনে ঝুঁকে পড়বে। কারণ, এ সমস্ত জিনিসও একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করে। আপনি যখন তাঁরই হুকুম পালন করে চলবেন, তখন আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই আপনার সাথী হবে, কারণ এসবই যে একমাত্র তাঁরই অনুগত। আপনি যখন তাঁর পথে চলতে শুরু করবেন, তখন আপনি একাকী হবেন না, এ নিখিল জাহানের অগণিত 'সৈন্য' আপনার সাথে চলতে আরম্ভ করবে। কারণ, আকাশের সূর্য হতে শুরু করে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বস্তুকণা পর্যন্ত সর্বদা তাঁরই নির্ধারিত পথে চলছে। আপনি যখন সেই এক আল্লাহর ওপর নির্ভর করবেন, তখন সামান্য শক্তির ওপর নির্ভর করা হবে না—আপনার ভরসা করা হবে এমন এক বিরাট শক্তির ওপর, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত শক্তি ও ধন-সম্পদের একমাত্র মালিক। মোটকথা, এ নিগূঢ় তত্ত্ব যদিও আপনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে চলেন, তবে আপনি ভালো করেই জানতে পারবেন যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি ঈমান এনে যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে সেই আদর্শ অনুসারে গঠন করে নেবে, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় শক্তিই তার সাহায্য কাজে নিযুক্ত হবে। দুনিয়ার জীবন হতে পরকাল পর্যন্ত সে কেবল উন্নতিই করতে থাকবে। তার কোনো চেষ্টাই ব্যর্থ হবে না, কোনো উদ্দেশ্যই অপূর্ণ থাকতে পারবে না। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা একথাই বলেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ 'এই কালেমা এমন একটা গাছ, যার শিকড় গভীর মাটির তলে মজবুত হয়ে গেঁথে রয়েছে এবং শাখা প্রশাখা আকাশের মহাশূন্যে বিস্তৃত হয়ে আছে। আর সবসময়ই তারা আল্লাহর হুকুমে ফলদান করে থাকে।'

'কালেমায়ে খাবীসাহ' এর সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ উপস্থিত করে। কালেমায়ে খাবীসাহ অর্থ ঃ এ দুনিয়ার ইলাহ বা সৃষ্টিকর্তা কেউ নেই, কিংবা এ দুনিয়ায় একাধিক ইলাহ রয়েছে। একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, তা অপেক্ষা বড় মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন কথা আর কিছুই হতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই বলে ওঠে, তুমি মিথ্যাবাদী, নিশ্চয়ই আল্লাহ আছেন। আমাদেরকে আর তোমাদেরকে সেই আল্লাহই তো সৃষ্টি করেছেন। আর সে আল্লাহই তোমাকে ঐ জিহ্বা দিয়েছেন যার দ্বারা তুমি এতবড় একটা মিথ্যা কথা বলছো। মুশরিক বলে যে, আল্লাহ এক নয়, তাঁর সাথে আরও অনেক দেবদেবী রয়েছে। তারাও রেযেক দেয়, তারাও তোমাদের মালিক, তারাও তোমাদের ভাগ্য গড়তে ও ভাংগতে পারে। উপকার করা কিংবা ক্ষতি করার ক্ষমতা তাদেরও আছে। তোমাদের দোয়া তারাও শুনতে পারে। তারাও তোমাদের মকসুদ পূর্ণ করতে পারে, তাদেরকে ভয় করে চলা উচিত। তাদের ওপর ভরসা করা যেতে পারে। দুনিয়া পরিচালনার ব্যাপারে তাদেরও হুকুম চলে। আল্লাহ ছাড়া তাদেরও হুকুম পালন করে চলা কর্তব্য। এসবই কালেমায়ে খাবীসাহ। এসব কথার উত্তরে আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস বলে ওঠে ঃ 'তুমি মিথ্যাবাদী, তোমার প্রত্যেকটা কথাই সত্যের বিলকুল খেলাফ।' এখন ভেবে দেখুন, এ কালেমা যে ব্যক্তি কবুল করবে এবং সে অনুসারে নিজের জীবনকে গঠন করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে সে কেমন করে উন্নতি লাভ করতে পারে ? আল্লাহ অনুগ্রহ করে এসব লোককে অবসর ও অবকাশ দিয়ে রেখেছেন এবং রেযেক দেবারও ওয়াদা করেছেন। কাজেই আকাশ ও পৃথিবীর শক্তিগুলো কিছু না কিছু পরিমাণে তাদেরকে প্রতিপালন করবে—যেমন বন-জঙ্গলে আগাছা-পরগাছাগুলোকে করছে। কিন্তু পৃথিবীর কোনো একটা জিনিসও আগ্রহ করে তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং পূর্ণশক্তি দিয়ে তাদের সহায়তা করবে না। তারা ঠিক জঙ্গলের আগাছার মতই কিছুদিন মাত্র বেঁচে থাকতে পারবে—তার বেশী নয়।

উক্তরূপ পার্থক্য এ কালেমাদ্বয়ের পরিণাম ফলের ব্যাপারেও বর্তমান রয়েছে। 'কালেমায়ে তাইয়্যেবা' যখন ফল দান করবে, তখন তা খুবই মিষ্ট ও সুস্বাদুই হবে। দুনিয়ার বুকে তা দ্বারা শান্তি স্থাপিত হবে। চারদিকে সত্য ও পূর্ণ সুবিচার কায়েম হবে। নিখিল দুনিয়ার মানুষ তা দ্বারা অসাধারণ উপকার লাভ

করতে পারবে। কিন্তু কালেমায়ে খাবীসাহ যতই বৃদ্ধি পাবে, কেবল কাঁটায় ভরা ডাল-পালাই তা হতে বের হবে। তিক্ত ও বিষাক্ত ফল তাতে ফলবে। এর শিরায় শিরায় বিষ ভরা থাকবে। নিজেদের চোখ দিয়েই আপনারা তা দেখে নিতে পারেন। দুনিয়ার যেখানেই কুফরি, শিরক এবং নাস্তিকতার জোর বেশী, সেখানে কী হচ্ছে ? সেখানে মানুষ মানুষের রক্ত পান করছে। দেশের পর দেশ গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করার আয়োজন খুব জোরের সাথেই চলছে। বিষাক্ত গ্যাস তৈরী হচ্ছে। এক জাতি অন্য জাতিকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য ওঠেপড়ে লেগেছে। শক্তিমান দুর্বল ব্যক্তিগণকে নিজের গোলাম বানিয়ে রেখেছে—তার ভাগের রুটি কেড়ে নেবার জন্য শুধু দুর্বল মানুষকে সেখানে সৈন্য, পুলিশ, জেল ও ফাঁসির ভয় দেখিয়ে অবদমিত করে রাখার এবং শক্তিশালী জাতির যুলুম নীরবে সহ্য করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। এছাড়া এসব জাতির ভিতরের অবস্থা আরও ভয়ানক খারাপ। তাদের নৈতিক চরিত্র এতই কদর্য যে, স্বয়ং শয়তানও তা দেখে লজ্জা পায়। মানুষ সেখানে জন্তু-জানোয়ার অপেক্ষাও হীনতর কাজ করছে। মায়েরা সেখানে নিজেদের হাতেই নিজেদের সন্তানকে হত্যা করছে—যেন এ সন্তান তাদের সুখ-সম্ভোগের পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে। স্বামীরা সেখানে নিজেদের স্ত্রীদেরকে অন্যের কোলে ঠেলে দিচ্ছে শুধু পরের স্ত্রীকে নিজের বুকে পাবার উদ্দেশ্যে। উলংগদের ক্লাব ঘর তৈরী করা হয়েছে, সেখানে নারী-পুরুষ পশুর মতো উলংগ হয়ে চলাফেরা করছে। ধনী ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করে গরীবদের প্রতি কেনা গোলামের ন্যায় ব্যবহার করছে। মনে হয়, কেবল তাদেরই খেদমত করার জন্য দুনিয়ায় এদের জন্ম হয়েছে। মোটকথা, এ 'কালেমায়ে খাবীসা'র দরুন সেখানে কাঁটায় চারদিকে ভরে গেছে; আর যে ফলই তাতে ফলছে তা হয়েছে ভয়ানক তিক্ত ও বিষাক্ত।

আল্লাহ্ তাআলা এ দু'টি উদাহরণ বিশ্লেষণ করার পর বলেছেন, 'কালেমায়ে তাইয়্যেবা'র প্রতি যারা ঈমান আনবে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে একটি মজবুত বাণীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন—তারা অটল ও অক্ষয় হবে। আর তার মোকাবিলায় 'কালেমায়ে খাবীসা'কে যারা বিশ্বাস করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সকল আয়োজন ও চেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দেবেন। তারা কখনই কোনো সহজ কাজ করতে পারবে না। তা দ্বারা দুনিয়া কিংবা আখেরাতে তাদের কিছুমাত্র কল্যাণও সাধিত হতে পারে না।

'কালেমায়ে তাইয়্যেবা' ও 'কালেমায়ে খাবীসা'র পার্থক্য ও উভয়ের ফলাফল আপনারা শুনলেন। এখন আপনারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, আমরাও 'কালেমায়ে তাইয়্যেবা'কে মানি কিন্তু তবু কোন্ কারণে

আমাদের উন্নতি হয় না ? আর যে কাফেরগণ কালেমায়ে খাবীসাকে বিশ্বাস করে তারাই বা কোন্ কারণে এত শক্তিমান ও উন্নত হচ্ছে ?

এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার ভার আমার ওপর। আমি এর জবাব দেব, কিন্তু পূর্বেই বলেছি, আমার জবাব শুনে কেউ রাগ করতে পারবেন না। আমার জবাব ঠিক কি না আপনারা শুধু তাই বিচার করে দেখবেন।

আপনারা কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি ঈমান এনেছেন বলে দাবী করেন এবং তবুও আপনাদের উন্নতি হচ্ছে না, প্রথমত একথাটাই মিথ্যা। কারণ কেবল মুখে মুখে কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়লেই কোনো কাজ হয় না, তা মন দিয়ে পড়তে হবে। মন দিয়ে পড়ার অর্থ বিশ্বাস ও মতবাদের পরিবর্তন করা। এর বিরোধী কোনো বাদ বা মতবাদ যেন কালেমা বিশ্বাসী ব্যক্তির মনে স্থান না পায় এবং কালেমার নির্দেশের বিপরীত কোনো কাজও যেন সে কখনও না করে। কিন্তু বলুন, আপনাদের প্রকৃত অবস্থা কি এরূপ ? আপনাদের মধ্যে কি কালেমায়ে তাইয়্যেবার বিপরীত হাজারও কুফরি ও মুশরিকী ধারণা বর্তমান নেই ? মুসলমানের মাথা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোও সামনে নত হয় না ? মুসলমান আল্লাহ ছাড়া অন্য লোককে কি ভয় করে না ? অন্যের সাহায্যের ওপর কি ভরসা করে না ? আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও কি তারা রেযেকদাতা বলে বিশ্বাস করে না ? আল্লাহর আইনকে ছেড়ে দিয়ে তারা খুশী হয়েই কি অন্যের আইন অনুসরণ করে চলে না ? মুসলমান হবার দাবীদার লোকেরা আদালতে গিয়ে পরিষ্কারভাবে বলে না যে, আমরা শরীয়াতের বিচার চাই না ? আমরা দেশের প্রচলিত প্রথামত বিচার চাই ? আপনাদের মধ্যে এমন কোনো লোককি নেই, যারা দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ লাভের জন্য আল্লাহর আইন লংঘন করতে একটুও পরোয়া করে না ? আপনাদের মধ্যে এমন লোক কি নেই, যারা কাফেরদের ক্রোধের ভয়ে ভীত ; কিন্তু আল্লাহর গযবকে মোটেই ভয় করে না ? এমন লোক কি আপনাদের মধ্যে নেই, যারা কাফেরদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করার জন্য সবকিছুই করতে প্রস্তুত, কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ দৃষ্টি লাভ করার জন্য কিছুই করতে রাজী নয় ? এমন লোকও কি নেই, যারা কাফেরদের রাজত্বকে 'রাজত্ব' বলে মনে করে, কিন্তু আল্লাহর রাজত্ব যে কোথাও বর্তমান আছে, সেই কথা তাদের একেবারেই মনে পড়ে না ? সত্য করে বলুন, এসব কথা কি সত্য নয় ? যদি বাস্তবিকই সত্য হয়ে থাকে, তবে আপনারা কালেমায়ে তাইয়্যেবাকে স্বীকার করেন এবং তা সত্ত্বেও আপনাদের উন্নতি হয় না একথা কোন্ মুখে বলতে পারেন ? প্রথমে খাঁটি মনে ঈমান আনুন এবং কালেমায়ে তাইয়্যেবা অনুসারে জীবনকে গঠন করুন। তারপর যদি গভীর মাটির তলে মজবুত শিকড় ও শূন্য আকাশে বিস্তৃত শাখার সেই মহান গাছের জন্ম না হয়,

তখন বলতে পারবেন যে, আল্লাহ মিথ্যা ওয়াদা করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। পরন্তু কালেমায়ে খাবীসাহ বিশ্বাসী লোক দুনিয়ায় খুবই উন্নতি লাভ করছে বলে মনে করাও সম্পূর্ণরূপে ভুল। কারণ কালেমায়ে খাবীসাকে যারা মানবে তারা উন্নতি লাভ করতে পারে না ; অতীতে কখনও পারেনি আর এখনও পারছে না। তাদের ধন-দৌলত, সুখ-শান্তি ও স্ফূর্তির জীবন, বিলাসিতা ও আনন্দের সাজ-সরঞ্জাম এবং বাহ্যিক শান-শওকত দেখে আপনারা হয়ত মনে করেছেন যে, তারা আসলে বুঝি খুবই উন্নতি করছে। কিন্তু আপনারা তাদের মনের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন, তাদের মধ্যে কতজন লোক বাস্তবিকই শান্তিতে আছে ? বিলাসিতা ও সুখের সরঞ্জাম তাদের প্রচুর আছে ; কিন্তু মনের মধ্যে আগুনের উলকাপিণ্ড সবসময় দাউ দাউ করে জ্বলছে। এজন্যই তারা এক আল্লাহকে পেতে পারে না। আল্লাহর আইন অমান্য করার কারণে তাদের প্রত্যেকটি পরিবার জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হচ্ছে। খবরের কাগজ খুলে দেখুন, ইউরোপ ও আমেরিকায় আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে গেছে। কত অসংখ্য তালাক দিন-রাত সংঘটিত হচ্ছে। সেই দেশের সন্তান কিভাবে নষ্ট করা হচ্ছে এবং ওষুধ ব্যবহার করে জন্মের হার কমিয়ে দেয়া হচ্ছে। নানা প্রকার দূষিত রোগে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে খাদ্য নিয়ে কিভাবে টানাটানি ও কাড়াকাড়ি চলছে। হিংসা-দ্বেষ এবং শত্রুতা এক জাতীয় মানুষের মধ্যে কিভাবে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। বিলাসিতার লোভ মানুষের জীবনকে কতখানি তিক্ত করে দিয়েছে। দুনিয়ার এসব বড় বড় চাকচিক্যময় শহরে দূর হতে দেখে যাকে আপনারা স্বর্গের সমান মনে করেন —লক্ষ লক্ষ লোক কি দুঃখের জীবন যাপন করছে, তা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। .... এটাকে কি কখনও উন্নতি বলে মনে করা যায় ? এ 'স্বর্গ' পাবার জন্যই কি আপনারা লালায়িত ?

মনে রাখবেন, আল্লাহর বাণী কখনও মিথ্যে হতে পারে না। বাস্তবিকই কালেমায়ে তাইয়্যেবা ছাড়া আর কোনো 'কালেমা' এমন নেই, যা অনুসরণ করে মানুষ দুনিয়ায় সুখ এবং পরকালে মহাশান্তি লাভ করতে পারে। যে দিকে ইচ্ছে আপনারা চোখ খুলে চেয়ে দেখুন, এ সত্যের বিপরীত আপনারা কোথাও দেখতে পাবেন না।

কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্য

পূর্বেই দু'টি প্রবন্ধে কালেমায়ে তাইয়্যেবার বিশদ অর্থ আপনাদের সামনে ব্যক্ত করেছি ; বর্তমান প্রবন্ধে আমি কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি ঈমান আনার আবশ্যকতা এবং তার উপকারিতা ব্যক্ত করতে চেষ্টা করবো।

আপনারা সকলে জানেন যে, মানুষ দুনিয়ায় যে কাজই করুক না কেন, তার মূলে একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বর্তমান থাকে এবং কিছু না কিছু উপকার পাবার জন্যই মানুষ সে কাজ করে থাকে। বিনা উদ্দেশ্যে, বিনা গরজে এবং বিনা উপকারিতায় কোনো কাজ কেউই করে না। আপনারা পানি পান করেন কেন ? পান করেন এ জন্য যে, তাতে আপনাদের পিপাসা নিবারণ হয়। কিন্তু পানি পান করার পরও যদি আপনাদের পিপাসা না মিটতো তবে আপনারা কিছুতেই পানি পান করতেন না। কারণ, এ পানি পান করায় কোনো ফল নেই। আপনারা খাদ্যদ্রব্য কেন আহার করেন ? এ উদ্দেশ্যে যে, তাতে আপনাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে এবং আপনাদের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আহার ও অনাহার উভয়েরই ফল যদি একরূপ হয়, তবে খাদ্য ভক্ষণের কাজটাকে আপনারা একটা বাজে কাজ বলে মনে করতেন। রোগ হলে আপনারা ওষুধ সেবন করেন এ জন্য যে, তাতে রোগ দূর হয়ে যাবে এবং আপনারা পূর্ণ স্বাস্থ্যবান হবেন ; কিন্তু ওষুধ সেবন করার পরও যদি রোগ দূর না হয়, বরং পূর্বের মতোই অবস্থা বর্তমান থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই বলবেন, এ ওষুধ সেবন করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কৃষি কাজে আপনারা এত পরিশ্রম করেন কেন ? করেন এ জন্য যে, আপনারা এর দ্বারা শস্য, ফল ও নানারকমের তরিতরকারী পেতে পারবেন। কিন্তু বীজ বপন করার পরও যদি জমিতে কোনো শস্য না হয় তবে আপনারা হাল-চাষ, বীজ বোনা এবং তাতে পানি দেয়ার জন্য এতদূর কষ্ট কিছুতেই স্বীকার করতেন না। মোটকথা দুনিয়ায় আপনারা যে কাজই করেন না কেন, তাতে উদ্দেশ্য সফল হলে কাজ ঠিকমত হয়েছে বলে মনে করা হয়। আর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে আপনারা বলেন যে, কাজ ঠিকমত করা হয়নি।

এ নিগূঢ় কথাটি মনে রাখুন তারপর আপনারা আমার এক একটা প্রশ্নের জবাব দিতে থাকুন। প্রথম প্রশ্ন এই যে, কালেমা পড়া হয় কেন ? এ প্রশ্নের জবাবে আপনি এছাড়া আর কিছুই বলতে পারেন না যে, কালেমা পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর দ্বারা কাফের ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা। কিন্তু

আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, কাফের ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করার অর্থ কি ? এর অর্থ কি এই যে, কাফেরের দু'টি চোখ, কাজেই মুসলমান কালেমা পড়লে তার চারটি চোখ হবে ? অথবা কাফেরের মাথা একটি কাজেই মুসলমানের মাথা দু'টি হবে ?...আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে, না এখানে দৈহিক পার্থক্যের কথা বলা হচ্ছে না। পার্থক্য হওয়ার আসল অর্থ এই যে, কাফেরের পরিণাম ও মুসলমানের পরিণাম পার্থক্য হবে। কাফেরের পরিণাম এই যে, পরকালে সে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হবে এবং তার জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যাবে। আর মুসলমানের পরিণাম এই যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে এবং পরকালে সে সফল হবে—মহাসুখে কালযাপন করবে।

আপনাদের এ জবাব শুনে আমি বলবো যে, আপনারা ঠিক জবাবই দিয়েছেন। কিন্তু আপনারা আমাকে বলুন ঃ পরকাল কাকে বলে ? পরকাল বিফল ও সার্থক হওয়ার অর্থ কি ? আর সেখানে সফলতা ও কামিয়াবী লাভের তাৎপর্যইবা কি ? একথাগুলো ভাল করে বুঝে নিতে না পারলে পরবর্তী আলোচনা শুরু করা যায় না।

এ প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে না। পূর্বেই এর জবাব দেয়া হয়েছে? বলা হয়েছে ঃ اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ ঃ "ইহকাল পরকালের কৃষি ক্ষেত।"

দুনিয়া ও আখেরাত দু'টি ভিন্ন জিনিস নয়। উভয়ই মানুষের একই পথের দু'টি মনজিল। দুনিয়া এ পথের প্রথম মনজিল, আর আখেরাত সর্বশেষ মনজিল। জমি চাষ করা এবং তা হতে ফসল পাওয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক এ দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে ঠিক সে সম্পর্কই বিদ্যমান। আপনারা জমিতে হাল-চাষ করেন, তার পরে বীজ বপন করেন, দরকার হলে তাতে পানি দেন, তার পরে আপনারা ফসল পেতে পারেন। সেই ফসল ঘরে এনে তা আপনারা সারা বছর নিশ্চিত হয়ে খেতে থাকেন। আপনি জমিতে যে জিনিসেরই চাষ করবেন, ফলও তারই পাবেন। ধান বপন করলে ধান পাবেন, পাট বপন করলে পাট পাবেন, গম বপন করলে গমেরই ফসল পাবেন, কাঁটার গাছ যদি বপন করেন, তবে কাঁটার গাছই আপনার ক্ষেতে জন্মাবে। আর যদি কিছুই বপন না করেন, তবে আপনার ক্ষেতে কিছুই জন্মাবে না। তারপর হাল-চাষ করতে, বীজ বপন করতে, তাতে দরকার মত পানি দিতে এবং ক্ষেতের দেখাশুনা করতে যে ভুল-ত্রুটি আপনার দ্বারা হয় তার মন্দ ফল আপনার ফসল কাঁটার সময়ই জানতে পারেন। আর এসব কাজ যদি আপনি খুব ভালভাবে করে থাকেন, তবে ফসল কাঁটার সময়ই আপনি এর বাস্তব ফল দেখতে পাবেন। দুনিয়া ও আখেরাতের অবস্থাও ঠিক এরূপ। দুনিয়াকে মনে করেন একটা

ক্ষেত। এখানে নিজের পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা নিজের জন্য ফসল উৎপন্ন করার উদ্দেশ্যে মানুষকে পাঠান হয়েছে। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে এ কাজের জন্য সময় দেয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে মানুষ যে ফসলেরই চাষ করে, সেই ফসলই সে মৃত্যুর পর পরকালের জীবনে পেতে পারবে, আর যে ফসলই সেখানে পাবে তার পরকালীন জীবন একমাত্র তারই ওপর নির্ভর করবে। যদি কেউ দুনিয়ায় জীবন ভর ভাল ফসলের চাষ করে, তাতে দরকার মত পানি দেয় এবং তার দেখাশুনাও যদি খুব ভালভাবে করে, তবে পরকালের জীবনে সে যখনই পা রাখবে, তখনই তার পরিশ্রমের ফল স্বরূপ একটি ফলেফুলে ভরা শ্যামল বাগিচা দেখতে পাবে। তাকে এ পরকালের জীবনে আর কোনো পরিশ্রম করতে হবে না, বরং দুনিয়ায় জীবন ভর শ্রম করে যে বাগান সে তৈরী করেছে, সেই বাগানের অফুরন্ত ফলেই তার জীবন সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হবে। এ জিনিসেরই নাম হচ্ছে জান্নাত। এটা লাভ করতে পারলেই বুঝতে হবে যে, পরকালে সে সফল ও কামিয়াব হয়েছে।

কিন্তু যে ব্যক্তি তার দুনিয়ার জীবনে কেবল কাঁটা, তিক্ত ও বিষাক্ত ফলের বীজ বপন করে, পরকালের জীবনে শুধু তারই ফসল পাবে। সেখানে খারাপ ফসল নষ্ট করে দিয়ে ভাল ফসল তৈরী করার এবং নিজের এ নির্বুদ্ধিতার পরিবর্তে বুদ্ধিমানের মত কাজ করার কোনো সুযোগ বা সময় সে আর পাবে না। সেই খারাপ ফসলের দ্বারাই পরকালের সমস্ত জীবন কাটাতে হবে, কারণ দুনিয়ায় সে শুধু এরই চাষ করেছে। যে কাঁটা সে রোপণ করেছিল, পরকালে তাকে সেই কাঁটার শয্যায়ই শায়িত করা হবে। আর যে তিক্ত ও বিষাক্ত ফলের চাষ করেছিল, সেখানে তাঁকে তাই ভোগ করতে হবে। পরকালে ব্যর্থ ও বিফল হওয়ার অর্থ এটাই।

আখেরাতের ব্যাখ্যা এইমাত্র আমি করলাম, কুরআন ও হাদীস হতেও এটাই প্রমাণিত হয়। এ ব্যাখ্যা হতে নিসন্দেহে জানা গেল যে, পরকালের জীবনে মানুষের বিফল কিংবা সফল হওয়া এবং তার পরিণাম ভাল কিংবা মন্দ হওয়া প্রকৃতপক্ষে তার এ দুনিয়ার জীবনের ইলম ও আমল, জ্ঞান ও কাজের ভাল কিংবা মন্দ হওয়ারই একমাত্র ফল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

একথাটি বুঝে নেয়ার সাথে সাথে একথাটিও অতি সহজেই বুঝতে পারবেন যে, মুসলমান ও কাফেরের পরিণাম ফলের পার্থক্য বিনা কারণে হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পরিণামের পার্থক্য প্রথম সূচনার পার্থক্যের ফলমাত্র। দুনিয়ায় যদি মুসলমান এবং কাফেরের জ্ঞান ও কাজের পার্থক্য না হয়, তবে পরকালেও তাদের পরিণামের দিক দিয়ে কোনোই পার্থক্য হতে পারে না। দুনিয়ায় এক ব্যক্তির জ্ঞান ও কাজ ঠিক একজন কাফেরের জ্ঞান ও কাজের

মতই হবে অথচ পরকালে কাফেরের দুঃখময় পরিণাম হতে সে বেঁচে যাবে, এটা কিছুতেই হতে পারে না।

এখন আবার সেই গোড়ার প্রশ্ন জেগে ওঠে যে, কালেমা পড়ার উদ্দেশ্য কি ? প্রথমে আপনি এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, কাফেরের পরিণাম ও মুসলমানের পরিণামে পার্থক্য হওয়াই কালেমা পড়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। তারপরে আপনি পরিণাম ও পরকালের যে ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন, সেই অনুসারে আপনার প্রদত্ত জবাব সম্পর্কে আপনাকে আবার একটু ভেবে দেখতে হবে এবং আপনাকে এখন একথাই বলতে হবে যে, কালেমা পড়ার উদ্দেশ্য দুনিয়ার মানুষের ইলম বা জ্ঞান ও কাজকে ঠিক এমনভাবে করা—যেন পরকালে তার পরিণাম ভালো হয়। পরকাল মানুষকে এ দুনিয়ায় সেই ফলের বাগান তৈরির কাজ শিক্ষা দেয়। মানুষ যদি এ কালেমাকেই স্বীকার না করে তবে সেই বাগান লাগাবার নিয়ম সে মোটেই জানতে পারবে না। তাহলে সে বাগানই বা তৈরি করবে কি করে, আর পরকালে সে কিসের ফল ভোগ করবে ? মানুষ যদি কেবল মুখে মুখেই এ কালেমা পড়ে ; কিন্তু তার জ্ঞান যদি কালেমা না পড়া ব্যক্তির মতো হয় এবং তার কাজ-কর্ম যদি একজন কাফেরের মতো হয়, তাহলে তার বিবেক বলে ওঠবে যে, এভাবে কালেমা পড়ায় কোনোই লাভ নেই। এমন ব্যক্তির পরিণাম একজন কাফেরের পরিণামের চেয়ে ভাল হবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। শুধু মুখ দিয়ে কালেমা পড়ে আল্লাহর ওপর সে কোনো অনুগ্রহ করেনি। কাজেই বাগান বানাবার নিয়ম না শিখে, বাগান তৈরি না করে এবং সারা জীবন কেবল কাঁটার চাষ করে কোনো মানুষই পরকালের সবুজ-শ্যামল ও ফুলে-ফলে ভরা বাগান লাভ করতে পারে না। সেরূপ ধারণা করাও আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। পূর্বে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে প্রকাশ করেছি, যে কাজ করা এবং না করা উভয়েরই ফল এক রকম, সেই কাজের কোনো দাম নেই, তা একেবারেই অর্থহীন। যে ওষুধ সেবন করার পরও রুগীর অবস্থা ঠিক সেই রকম থাকে যেমন ছিল ওষুধ পান করার পূর্বে, তা আসলে ওষুধ নয়। ঠিক এ রকমই কালেমা পড়া মানুষের জ্ঞান এবং কাজ যদি ঠিক কালেমা না পড়া লোকদের মতোই থাকে তবে এমন কালেমা পড়া একেবারেই অর্থহীন। দুনিয়ায়ই যখন কাফের ও মুসলমানের বাস্তব জীবনধারায় কোনোরূপ পার্থক্য হলো না তখন পরকালে তাদের পরিণাম ফল ভিন্ন ভিন্ন হবে কেন ?

এখন কালেমায়ে তাইয়্যেবা মানুষকে কোন্ ধরনের জ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং সেই জ্ঞান শেখার পর মুসলমান ও কাফেরের দৈনন্দিন কাজে কোন্ ধরনের পার্থক্য হওয়া বাঞ্ছনীয় তারই আলোচনা করবো।

দেখুন, এ কালেমা হতে আপনি সর্বপ্রথম জানতে পারেন যে, আপনি আল্লাহর বান্দাহ, আর কারো বান্দাহ আপনি নন। একথা যখন আপনি জানতে পারলেন তখন আপনা আপনি একথাও আপনার জানা হয়ে গেল যে, আপনি যার বান্দাহ দুনিয়ায় তাঁরই মর্জিমত আপনাকে কাজ করতে হবে। কারণ তাঁর মর্জির খেলাফ যদি আপনি চলেন বা কাজ করেন, তবে আপনার মালিকের বিরুদ্ধে আপনার বিদ্রোহ করা হবে।

অতএব এ কালেমা আপনাকে শিক্ষা দেয় যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। একথা জেনে নেয়ার সাথে সাথে একথাও আপনি জানতে পারলেন যে, আল্লাহর রাসূল দুনিয়ার ক্ষেতে কাঁটা ও বিষাক্ত ফলের চাষ করার পরিবর্তে ফুল এবং মিষ্ট ফলের বাগান রচনা করার যে নিয়ম দেখিয়ে দিয়েছেন, আপনাকেও ঠিক সেই নিয়মেই কাজ করতে হবে। আপনি যদি সেই নিয়ম অনুসরণ করেন, তাহলেই পরকালে আপনি ভাল ফসল পেতে পারবেন। আর যদি তার বিপরীত পন্থায় কাজ করেন, তবে দুনিয়ায় আপনার কাঁটার চাষ করা হবে এবং পরকালে ঠিক কাঁটাই আপনি ফসলরূপে পাবেন, অন্য কিছু নয়।

এ জ্ঞান লাভের পর আপনার দৈনন্দিন জীবনধারাকেও সেই অনুসারে গঠন করতে হবে। আপনি যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আপনাকে একদিন মরতে হবে, মরার পরে এক ভিন্ন রকমের জীবন যাপন করতে হবে এবং সেই জীবনেও আপনাকে এ দুনিয়ায় অর্জিত ফসলের ওপর নির্ভর করে চলতে হবে, তাহলে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থাপিত নিয়ম ও বিধান অনুসরণ না করে অন্য কোনো পন্থা অনুযায়ী চলা আপনার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। দুনিয়ায় আপনি চাষাবাদ করেন কেন ? করেন এ জন্য যে, চাষ না করলে ফসল পাওয়া যাবে না। আর ফসল না হলে না খেয়ে মরতে হবে—একথার প্রতি আপনার খুবই বিশ্বাস আছে। আপনি যদি একথা বিশ্বাস না করতেন এবং যদি মনে করতেন যে, চাষ না করলেও ফসল ফলবে কিংবা ফসল ছাড়াও আপনি বেঁচে থাকতে পারবেন, তাহলে আপনি চাষাবাদের জন্য এত পরিশ্রম কিছুতেই করতেন না। এখন আপনি নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করুন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিজের প্রভু ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রাসূল মুখে মুখে স্বীকার করে এবং আখেরাতের ওপর বিশ্বাস আছে বলে দাবী করে কিন্তু তার দৈনন্দিন জীবনে কাজ-কর্ম আল্লাহর কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় চলে, তার সম্বন্ধে জেনে রাখুন যে, তার ঈমান প্রকৃতপক্ষে অতিশয় দুর্বল। সে নিজের

ক্ষেতের কাজ না করার মন্দ পরিণাম যেরূপ নিশ্চয়তার সাথে বিশ্বাস করে, যদি ততটুকু নিশ্চয়তার সাথে আখেরাতের জন্য ফসল তৈরি না করার দুঃখময় পরিণাম বিশ্বাস করতো, তবে কখনই সে পরকালের কাজে এরূপ অবহেলা প্রদর্শন করতে পারতো না। কেউ জেনে শুনে নিজের ভবিষ্যতের জন্য কাঁটা বীজের চাষ করে না। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে না যে, কাঁটা রোপণ করলে তা হতে কাঁটাই জন্মাবে, আর সেই কাঁটাই তাকে কষ্ট দেবে একমাত্র সেই ব্যক্তিই কাঁটা চাষ করতে পারে অন্য কেউ নয়। আপনি জেনে শুনে আপনার হাতে জ্বলন্ত অংগার কখনই নিতে পারেন না। কারণ আপনি নিশ্চিত জানেন যে, এতে হাত পুড়ে যাবে। কিন্তু একটি অবুঝ শিশু আগুনে হাত দেয়, কেননা তার পরিণাম যে কত কষ্টদায়ক তা সে আদৌ জানে না।

সমাপ্ত